লিদিয়া ক্রাস্নগোরস্কায়া

শিশু পালন

লিদিয়া ক্রাস্নোগোর্স্কায়া

শিশুপালন

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

Л. И. Красногорская

О ВОСПИТАНИИ
ДОШКОЛЬНИКА

На языке бенгали

সূচী

আমাদের ছেলেমেয়েরা হল স্বদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, বিশ্বের নাগরিক। ইতিহাস গড়বে তারা। আমাদের ছেলেমেয়েরা হল ভবিষ্যৎ জনকজননী — তারাও আবার মানুষ করে তুলবে নিজের সন্তানদের।

চমৎকার নাগরিক, উত্তম জনকজননী হয়ে গড়ে ওঠা চাই তাদের। কিন্তু সেই সব নয়: আমাদের ছেলেমেয়েরাই যে আমাদের বার্ধক্য। সঠিক লালনের অর্থ আমাদের সুখময় বার্ধক্য, খারাপ লালন পালন মানে আমাদেরই ভবিষ্যৎ দুঃখ, আমাদের অশ্রুপাত, অপরের কাছে, গোটা দেশের কাছে আমাদের অপরাধ।

আ. মাকারেঙ্কো*

সঠিক পারিবারিক লালন পালনের মূলকথা

যে শিশুদের স্কুলে যাবার মতো বয়স হয়নি তাদের লালন পালনে পরিবারের ভূমিকাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সর্বাঙ্গীন সঠিক বিকাশের বনিয়াদ গড়ে ওঠে ঠিক এই বয়সেই। শিশুদের পক্ষে পরিবার হল জীবনের প্রথম পাঠশালা, এখানে সে জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করে, আত্মস্থ করে

---

* আন্তন মাকারেঙ্কো (১৮৮৮-১৯৩৯) — বিখ্যাত সোভিয়েত শিক্ষাবিদ ও লেখক, যৌথের মধ্যে শিক্ষাদানের একটা বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি রচনা করেন। বিখ্যাত উপন্যাস 'শিক্ষাদানের কাব্য', 'বাঁচতে শেখা' এবং 'মা-বাপের বই', 'মানুষ করে তোলা' প্রভৃতি পুস্তক এবং বহু গল্প ও প্রবন্ধের লেখক। 'শিক্ষাদানের কাব্য', 'বাঁচতে শেখা' এবং 'মা-বাপের বই' প্রগতি প্রকাশন থেকে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। — সম্পাঃ

নৈতিক বোধ ও আচরণের মানদণ্ড, অর্জন করে জীবনের প্রতি, পরিবেশের প্রতি একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। পরিবার হল প্রথম স্বাভাবিক একটা যৌথ সংস্থা, তারই সভ্য বলে শিশু অনুভব করে নিজেকে।

প্রতি পরিবারেরই আছে একটা নিজস্ব ধরন, প্রতিটি শিশুরও আছে একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, শিশু গড়ে তোলার পদ্ধতি নির্বাচনে তার হিসেব রাখা আবশ্যক। বোঝাই যায় যে প্রতি পরিবার ও প্রত্যেক শিশুর পক্ষেই প্রযোজ্য কোনো তৈরি পদ্ধতি বা নিয়ম নির্দেশ করা চলে না। তবে সোভিয়েত শিক্ষাবিজ্ঞানের মূল নীতি এবং পারিবারিক লালনের অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ থেকে সুষ্ঠু পারিবারিক লালনের কতকগুলি মূল সর্ত নির্দেশ করা সম্ভব।

লালন পালনের লক্ষ্যটা কী তার পরিষ্কার ধারণা নইলে ছেলেমেয়েদের সঠিকভাবে গড়ে তোলা অসম্ভব।

মানুষ করে তোলার যে কর্তব্য সেটির নিখুঁত প্রণিধান, শিশুদের দৈনন্দিন পরিচালনায় তার প্রয়োগ — এ হল সফল শিশু পালনের এক মূল সর্ত।

মা-বাপের উদ্দেশে মাকারেঙ্কো বলেছেন:

'প্রতিটি বাপ প্রতিটি মাকে ভালো করে জানতে হবে ছেলেটিকে তাঁরা কী করে তুলতে চান। চান কি সে হবে সোভিয়েত দেশের খাঁটি নাগরিক, জ্ঞানী, উদ্যোগী, সৎ, জনগণের প্রতি, বিপ্লবের আদর্শের প্রতি অনুগত, হাসিখুশি ও অমায়িক? নাকি চান আপনার সন্তান থেকে দেখা দেবে এক কূপমণ্ডূক, লোভী, ভীরু, ধূর্ত হীনচেতা কারবারী। কষ্ট করে এই নিয়ে ভাবুন, অন্তত মনে মনেও খানিকটা ভাবুন, তাহলেই অনেক জিনিস আপনার চোখে পড়বে যেখানে ভুল হয়েছে, অনেক পথ চোখে পড়বে যেটা সামনে এগুবার মতো।'

শিশুর একেবারে শৈশব থেকেই তার কায়িক, মানসিক, নৈতিক ও সৌন্দর্য বোধ বিকাশের সুনির্দিষ্ট ধারা স্থির করে নেওয়া উচিত।

বাড়ন্ত শিশুর পক্ষে তার **সঠিক দেহ চর্চা** অতি তাৎপর্যপূর্ণ। সব মা-বাপেই তা জানেন। কিন্তু প্রায়ই শিশুর স্বাস্থ্য ও কায়িক বিকাশের যত্ন নিতে গিয়ে তাঁরা যখন লালন পালনের অন্যান্য দিকগুলিকে চাপা দিতে চান তখন যে ভুল তাঁরা করে বসেন সেটা শোধরানো কঠিন।

স্কুল যাবার মতো বয়স হবার বেশ আগে থেকেই ভবিষ্যৎ ব্যক্তিটির বনিয়াদ পাতা হয়ে যায়, গড়ে ওঠে তার মূল নৈতিক গুণাবলী: দেশের প্রতি ভালোবাসা, যৌথ অভ্যাস, শ্রমের প্রতি আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা, শৃঙ্খলাবোধ, যৌথের কাছে দায়িত্ববোধ, সততা, ন্যায়পরতা, ধৈর্য এবং লক্ষ্যার্জনে অধ্যবসায়।

এই বয়সের শিশুদের নৈতিক লালনের একটা স্বকীয় ধারা আছে। তাদের নৈতিক গুণ গড়ে ওঠে খেলাধুলা ও শিশুসুলভ কাজকর্ম এবং দৈনন্দিন জীবনের মধ্য দিয়ে। যেমন ছেলেপিলেদের সবাই মিলে মিশে খেলা, খেলনাপাতির ভাগ দেওয়া, পরস্পরকে সাহায্য, বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধা, যৌথের নিয়মগুলি পালন করা, খেলনাপাতি গুছিয়ে রাখা, গাছপালা ও পোষা জীবজন্তুর দেখা শোনা করা, বিবেক মেনে দায়িত্ব পালন করা — এসব শেখানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ছেলেপিলেদের স্বাস্থ্যের পক্ষে, তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও স্বাবলম্বনের গুণ জাগিয়ে তোলার পক্ষে নিয়মিত ও সুসঙ্গতভাবে তাদের মধ্যে ভব্যতা ও স্বাস্থ্যের অভ্যাস, নিজেরটা নিজে করা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি আকর্ষণ গড়ে তোলার তাৎপর্য অনেক।

এই বয়সের শিশুদের বৈশিষ্ট্য হল সহজেই বাইরের প্রভাবে পড়া, অন্যের নকল করা; তারা তখন অত্যন্ত কর্মচঞ্চল ও সংবেদনপ্রবণ। এই বৈশিষ্ট্যের দরুন দৃষ্টান্ত রাখার, দেখিয়ে দেওয়া, নির্দেশ দেওয়ার, তাদের কর্মচাঞ্চল্যের দৈনন্দিন চালনার গুরুত্ব অনেক বেড়ে ওঠে।

নৈতিক ও মানসিক শিক্ষা পরস্পর অচ্ছেদ্য। লালনের যে লক্ষ্য ধরা হয়েছে সেই অনুসারেই স্থির হয় মানসিক বিকাশের উপাদান। স্বভাবতই অনূর্ধ্ব সাত বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের আমরা কোনো প্রাথমিক বিদ্যা আয়ত্ত করাতে চাই না, কিন্তু পরিপার্শ্বের জীবন পর্যবেক্ষণ, শিশুসাধ্য অনুশীলন, কথকতা, সাহিত্য পড়ে শোনানো, খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের মানসিক দিগন্তের প্রসার, তাদের ভাষা, চিন্তা, স্মৃতি, কল্পনার বিকাশ, তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানতৃষ্ণা ও অন্যান্য গুণ জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন, সেটা প্রয়োজন স্কুলের শিক্ষা সফল করে তোলার জন্য। ছেলেরা প্রায়ই বড়ো ভাই বোনদের অনুকরণ করে, ইশকুল-ইশকুল খেলে: 'ইশকুল চললাম,' বইপত্তর গুছিয়ে

নিয়ে বলে বাচ্চা। তার এ আগ্রহে সর্বদিক দিয়ে উৎসাহ দেওয়া উচিত, স্কুল যেন তার কাছে হয়ে ওঠে আনন্দে ভরা সেই ভবিষ্যৎ যার স্বপ্ন সে দেখছে, যার জন্যে সে তৈরি হচ্ছে।

ছেলেদের মানসিক বিকাশের পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হল পরিবেশের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয়।

এই শিশুদের মধ্যে যারা একটু বড়ো তাদের পক্ষে প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ, পালিত পশু পাখি গাছপালার পরিচর্যা, ঘরোয়া ক্ষেত বা বাগানে খাটাখাটনি, বড়ো বড়ো কৃষিযন্ত্র নিয়ে বড়োরা যে কাজ করছে তা খুঁটিয়ে দেখা — এতে তার মনের দিগন্ত প্রসারিত হয়ে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও জ্ঞানতৃষ্ণাই শুধু বাড়ে না, প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্বের চেতনাও তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়, বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির বনিয়াদ গড়ে ওঠে।

অনূর্ধ্ব সাত বছরের শিশুরা ভারি আবেগপ্রবণ, বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চাইতে সে বেশি বোঝে অনুভূতি দিয়ে। ছবি, সঙ্গীত, গান, তার নিজস্ব শিল্পচর্চা যাতে সে তার পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতিকে রূপ দিতে চায় — এই সব শিল্প প্রতিমার প্রভাব তার ওপর খুব বেশি। মানসিক ও নৈতিক বিকাশের যে কর্তব্য তার সঙ্গে শিশুর শিল্পচর্চার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, এটা তার নৈতিক আদল গঠন, তার শিশুসুলভ দরদ ও অনুকরণীয় আদর্শ গড়ে তোলার দিক দিয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

পারিবারিক পালনের অভিজ্ঞতা বিচার করে দেখা গেছে যে বহু পরিবারেই একেবারে ছোটো থেকেই শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের দিকে বেশ নজর দেওয়া হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ সোভিয়েত ইউনিয়নের তরুণ বীর, মহান পিতৃভূমির যুদ্ধে 'তরুণ রক্ষী' নামক গুপ্ত যুব সংগঠনের নেতা ওলেগ কশেভয় যে পরিবারে মানুষ হয়েছিল তার কথা বলি।

পরিবারের কাছ থেকে ওলেগ গোড়া থেকেই দেশ প্রেম ও শত্রুর প্রতি ঘৃণা, ন্যায়পরতা ও সত্যনিষ্ঠার শিক্ষা পায়।

জনগণের যে সব বীর দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সাহসের সঙ্গে লড়েছে, ওলেগ শিশু থেকেই বাপের কাছে তাদের কাহিনী শুনেছে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। ঠাকুমা তাকে বলেছে তার নিজের জীবনের কাহিনী, বিপ্লবের আগে

আমিও গুনতে শিখছি

রাশিয়ার চাষীদের দুঃসহ জীবনের কথা। লেনিনের কথাও তার কাছেই শোনে ওলেগ।

পরিবারের মধ্যে একটা সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয় ওলেগের । শক্তসমর্থ ক্ষিপ্র শিশু ছিল ওলেগ। ছোটো থেকেই পোক্ত হবার, জলঝড়ের কেয়ার না করার শিক্ষা পায় সে, শীত গরম কিছুই সে গ্রাহ্য করত না। পাঁচ বছর বয়সেই ওলেগ বরফের মধ্যে স্কেইট করতে শুরু করে। ছেলেটির মধ্যে স্বাস্থ্যাভ্যাস ও স্বাবলম্বনের গুণ গড়ে তোলার জন্য খুবই মন দেন তার মা।

বিশেষ মন দেওয়া হয় তার নৈতিক গুণ বিকাশের দিকে। 'কিন্তু ওলেগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে আমি জাগাতে চেয়েছিলাম ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যপরতা, সত্য ও অসত্যের প্রতি একটা সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি। ছোটো থেকে ওলেগ সব ব্যাপারেই ছিল সত্যনিষ্ঠ। ছোটোখাটো ব্যাপারেও ও কখনো আমাদের ঠকায়নি, বড়ো ব্যাপারেও সে কাউকে প্রতারিত করেনি, যখন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে দেশের জন্য জীবন দিতে হয় তাকে।

'আমি চেয়েছিলাম আমার ছেলে সোভিয়েত দেশের যা কিছু ভালো তার প্রতি সজাগ থাকবে, শুভ ও সত্যে সাড়া দেবে,' ওলেগের মা 'ছেলের কাহিনী' গ্রন্থে এই কথা লিখেছেন।

ছোটো থেকেই ওলেগের মধ্যে সাহস ও সহ্যগুণ জাগিয়ে তোলা হয়।

'ওলেগ যখন হাঁটতে শুরু করে তখন সব শিশুর মতোই ও প্রথম প্রথম হাঁটতে গিয়ে আছাড় খেত। কিন্তু আমি কখনো তাকে তুলে ধরতাম না। চাইতাম ও নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটুক।

'ছেলেকে কখনো আমি নেকড়ে বা অন্য কোনো জীবজন্তুর ভয় দেখাইনি, অকারণ ভয় তার হত না, সানন্দেই সে ঘরে একা থাকত। কখনো কখনো আমি ইচ্ছে করেই তাকে অন্ধকার ঘরে খেলনা আনতে পাঠাতাম। ও বেশ নির্ভয়ে যেত, মেজের ওপর হাতড়ে হাতড়ে ঠিক খুঁজে বার করত খেলনা।

'গ্রীষ্মকালে ছেলের সঙ্গে প্রায়ই মাঠে বেড়াতাম। নদীর ওপর সরু একটা সাঁকো। ছেলেকে বলতাম "এগিয়ে যা ওলেগ।"

'আমি থাকতাম পেছনে, ছেলের ওপর নজর রেখে। জলের ওপর নড়বড় করছে সাঁকোটা। ওলেগ কিন্তু নিশ্চিন্তে কোনো দিকে না চেয়ে এগিয়ে যেত একা।

'সাত বছর বয়সে ওলেগের একবার কঠিন অস্ত্রোপচার করতে হয়। প্রফেসর ডাক্তার তাকে সাহস দিয়ে বলেন:

'"দেখছিস তো ওলেগ, সবাই এখানে মেয়ে, কেবল তুই আমি এই দুজন পুরুষ। ডেঁটে থাকবি কিন্তু। কাঁদিস না, কেউ যেন পরে আমাদের নিয়ে হাসাহাসি না করে।"

' "আমার কান্নাই পায়নি," চাঙ্গা হয়ে বললে ওলেগ, "ভাবছেন আমার বুঝি ভয় করছে। একেবারে না। সেই যেবার ছোটোতে বালতিতে লেগে কপাল কেটে গিয়েছিল তখনই বলে আমি কাঁদিনি!" মোটেই এটা কিন্তু ফাঁকা বড়াই নয়। কঁকিয়ে কুঁথিয়ে ডাক্তারকে এতটুকু বিব্রত করেনি ওলেগ।'

খুব ছেলেবেলাতেই ওলেগের বাপ মারা যায়; পরিবারে সে ছিল একমাত্র শিশু, কিন্তু তাতে করে তার মধ্যে যৌথ বোধ জাগানোয় অসুবিধা হয়নি। যেমন পরিবারের মধ্যে তেমনি সঙ্গীসাথীদের ক্ষেত্রেও সে ছিল যৌথের চমৎকার, দায়িত্বশীল সভ্য।

ছোটো থেকে মা, ঠাকুমা আর দাদুর ওপর তার ছিল ভারি ভালোবাসা, ভারি নজর, এটা সেটায় সাহায্য করতে চাইত তাদের।

'যখন ঘরোয়া বাগানে কাজ করতাম তখন সর্বদাই ওলেগকে কাজে টানার চেষ্টা করতাম। খুব একটা কাজের লোকের মতো ভাব করে, লাল হয়ে ও সানন্দেই আমায় বীজ আর চারা এনে দিত আর ভুঁই পাতার সময় দড়ি ধরে থাকত ভারিক্কী চালে,' এ. কশেভায়া লিখেছেন তাঁর 'ছেলের কাহিনী'তে।

সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে ওলেগের বন্ধুত্ব বজায় রাখা ও গড়ে তোলারও চেষ্টা করতেন মা, বন্ধুদের প্রতি দরদী ও বিনয়ী হবার শিক্ষা দেন তিনি।

'একবার মে দিবসের উৎসবের সময় আমি ছেলেকে দুটি নতুন পোষাক সেলাই করে দিই — তার একটি মামুলী, আর একটি নাবিকের স্যুট। নাবিকের স্যুটটি ওলেগের ভারি পছন্দ হল। কিন্তু হঠাৎ সে আমার কাছে এসে আমার আস্তিন টেনে আস্তে করে বললে, "আমার দুটো পোষাক কিন্তু গ্রিশার একটাও নেই। গ্রিশাকে ঐ নাবিকের স্যুটটা দিয়ে দিই মা, কী বলো ?" গ্রিশার সঙ্গে ওলেগ সারা দিন ধরে বাগানে খেলত। গ্রিশার বাপ ছিল না, মার অসুখ। আমি নীরবে নাবিকের স্যুটটা কাগজে মুড়ে দিলাম আর ওলেগ হাসি মুখে ছুটল তার ছোট্ট বন্ধুর কাছে।

'ওলেগকে সবাই খুবই ভালোবাসত কিন্তু কেউ তাকে কখনো অকারণ লাই দিত না। বাধ্য ও বিবেচক হয়ে সে বেড়ে ওঠে কিন্তু ছেলেমানুষী জিদ তারও ছিল। মাঝে মাঝে সে নিজের জেদ ধরে বেঁকে বসত, কিন্তু আমরা কখনো তাতে গলিনি। শুধু যেটা তার পক্ষে প্রয়োজন, চিত্তাকর্ষক ও হিতকর কেবল তারই অনুমতি দিতাম আমরা।'

জ্ঞানের আগ্রহ ছিল ওলেগের, পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা ছিল। সবকিছুই জানতে চাইত সে। ওর জ্ঞানের ভিত্তি ছিল সজীব জীবন, সজীব প্রকৃতি। সূর্যমুখীর টান যেমন সূর্যের দিকে, ওলেগের তেমনি টান ছিল লোকের দিকে। সবকিছুর ওপরেই সতৃষ্ণায় সে মেলে ধরত তার বড়ো বড়ো বাদামী চোখ।

প্রকৃতি ভারি ভালোবাসত সে, তার দাদু ফ. কশেভয় প্রকৃতির রহস্য খুলে ধরতেন তার কাছে।

'গোঁপের ফাঁকে মুচকি হেসে দাদু তাকে শোনাতেন ফলমূল শস্যের কথা, নানা ধরনের ঘাস পাতার কথা, দূর দূর দেশ আর পাখি পাখালির কথা। আমাদের রূপসী উক্রেন, গোটা বিশ্ব আর জীবন্ত সমস্ত কিছুকে ভালোবাসতে শেখান তিনি ওলেগকে। দেশের নিসর্গের প্রতি এই ভালোবাসা নিয়েই ওলেগ স্কুলে ঢোকে।'

কশেভয়দের সংসারে গান বাজনার আদর ছিল, ওলেগও ভালোবাসত গান বাজনা। 'গান কি সঙ্গীত গিয়ে বাজত সোজা তার বুকে, ও যেন কান দিয়ে নয় হৃদয় দিয়ে শুনত আমাদের উক্রেনীয় গান...

'এখনো যেন চোখে পড়ে: সন্ধ্যা, ছেলের ঘুমোবার সময়, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না তার। ওলেগের মস্ত এক বন্ধু তার কাকা, পাভেল কশেভয়, ভাইপোটিকে সে কোলে করে ঘরে পায়চারি করতে করতে আপন মনে গাইছে:

ওই, ওইরে কচি ছানাপোনা
ও মাসী, দোর খোলো না...

'এই গানটি ছিল ওলেগের ভারি প্রিয়। পাভেল কাকু থামলেই সে সমস্ত আবেগ নিয়ে বলত, "ছানাপোনাগুলোর কী যে কষ্ট! কেন দোর খুলছে না মাসী? ভারি পাজি মাসীটা।" '

ওপরের এই দৃষ্টান্ত থেকে খুব চমৎকার ধরা পড়ে যে কশেভয়দের পরিবারে শিশু পালনের লক্ষ্যটা ঠিক সময়েই, সঠিকভাবে, পরিষ্কার করে সামনে রাখা হয়েছিল। এঁরা ভালোই জানতেন শিশুর ভেতর কোন গুণগুলো জাগিয়ে তুলতে হবে। লক্ষ্যের পরিচ্ছন্নতা — এই হল শিশু পালনের পথ নির্দেশের সেরা দীপ।

ওলেগের জন্যে গর্ববোধ করার, নিজেকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করার যথেষ্ট কারণ ছিল তার মার। পড়াশুনায়·ছেলেটি ছিল প্রথম সারিতে, স্কুলের প্রথম দিন থেকেই সে সাগ্রহে সামাজিক কাজে মন দেয়, হয়ে ওঠে এক আদর্শ পুত্র।

'ছেলের কাহিনী' গ্রন্থে মা বলেছেন, 'তার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ছিল, প্রথমে কলেজে ঢুকবে, তারপর হবে ইঞ্জিনিয়র। আমায় সাহায্য করবে, কাজ থেকে অবকাশ দেবে, আমার বুড়ো বয়সে শ্রদ্ধা ভালোবাসায় ঘিরে রাখবে এই ছিল তার প্রতিশ্রুতি। "কাজে কি আর কেউ কাহিল হয়? কাহিল হয় শোকে। আর তুই যে বাছা আমার সবচেয়ে বড়ো আনন্দ!"'

কিন্তু ইঞ্জিনিয়র হয়ে ওঠা পর্যন্ত ওলেগ অপেক্ষা করেনি। তার প্রথম রোজগার সে যখন মাকে এনে দেয় তখনো সে নাবালক। তাঁর সেই শুভ দিনটির কথায় এ. কশেভায়া লিখেছেন:

'একদিন কাকু বললে, "ওলেগ, প্রথম রোজগারের টাকাটা কী জিনিস জানতে সাধ আছে তোর? মাইনে দেওয়া কাজ একটা আছে, তবে জানি না কাজ আর পড়াশুনা দুটোই চালাতে পারবি কিনা?" ওলেগ অমনি লাফিয়ে উঠল, ও তো জানত যে স্বামীর মৃত্যুর পর আমার জীবন আর সহজ ছিল না। "আমি প্রথমে স্কুলের পড়াটা শেষ করে পরে ঐ ড্র্যাফটিং-এর কাজটা করব। চালিয়ে নিতে পারব!"

'এ আলাপটার কিছুই আমি জানতাম না। হঠাৎ সপ্তাহ তিনেক পরে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকল ওলেগ, চোখ জ্বলজ্বল করছে, এক গাল হাসি। হাতে একটা মোড়ক। "এই নাও মা, তোমার জন্যে। আমার প্রথম রোজগার, এই নাও টাকা। ভাবনা কোরো না মা!.."

'সে টাকা আমার সোনার চেয়ে দামী...'

তারপর শুরু হল অন্ধকার দিন। আমাদের শান্তিপ্রিয় সোভিয়েত দেশের

ওপর নেমে এল ফ্যাশিবাদের গুরুভার খড়্গ। 'তরুণ রক্ষী'দের বৃহৎ সংগঠনের নেতৃত্বে গেল ওলেগ কশেভয়, মা তার ষোলো বছরের ছেলেকে আশীর্বাদ করে পাঠালেন কীর্তির পথে:

'আমি বুঝেছিলাম এক বৃহৎ উজ্জ্বল কর্মের ভার নিয়েছে ছেলেরা। জানতাম সংগ্রামটা হবে নির্মম, নিষ্করুণ।

'যেমন পারলাম ছেলেকে আমার মনের কথা বললাম। বললাম সংগ্রামের যে পথ ও নিয়েছে তার পদে পদে লুকিয়ে আছে বিপদ। নির্ভয়ে সে বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। ছেলে আমার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে চুপ করে সব শুনলে। "মা মণি... মানে, যদি মরতে হয় তাহলে আমার জন্যে তোমার কোনো লজ্জার কারণ থাকবে না।" একথা শুনে যেমন ভালো লাগল, তেমনি ভয় হল।

'কথাটা মেনে নিতে যতই কষ্ট হোক, বুক যতই মোচড় দিক, টের পেলাম, ছেলের জীবন আর আমার হাতে নয়, ওর প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গী এখন কেবল মৃত্যুর বিপদ।

'কিন্তু আমি তাকে থামাইনি। ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখের জলে, উপদেশ অনুরোধে এ দাবি করিনি যেন সে তার নির্বাচিত পথ পরিত্যাগ করে, ও যাতে ঘর ছেড়ে না যায়, যাতে লুকিয়ে থাকে সঙ্গীদের কাছ থেকে, লড়াই থেকে বাঁচে তার জন্যে হাত ধরে টেনে রাখিনি আমি। ছেলেটিকে আমি ভালোবাসতাম। সেই রাত্রিতে স্থির করলাম তাকে প্রাণপণে সাহায্য করব।'

এই আশ্চর্য রুশ মহিলা স্বাধিকারেই সোভিয়েত তরুণদের বলতে পারেন:

'আমার তরুণ পাঠকেরা! তোমাদের বাপেরা আর জ্যেষ্ঠ কমরেডরা নিজেদের রক্তের মূল্যে দুরূহ সংগ্রামে যা অর্জন করেছেন তা রক্ষা কোরো, ভালোবেসো। ভালোবেসো নিজের দেশের মাটিকে, তার প্রতিটি ঘাসকে, স্কুলের ডেস্কের পেছনে তোমার জায়গাটিকে। রক্ষা কোরো, মূল্যবান জ্ঞান কোরো ছোটো বড়ো সবকিছুকেই — তোমাদের জ্যেষ্ঠ কমরেডদের উপদেশ, তোমাদের মা-বাপের শ্রমজীর্ণ হাত, তাদের মুখের প্রতিটি বলিরেখা।

'নিজের চেয়েও বেশি ভালোবেসো এদের, স্বদেশের যশোবৃদ্ধি করে শেখো, শ্রম কোরো।

'ওলেগের জীবন ও সংগ্রাম যেন তোমাদের সাহায্য করে...'

জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা, উচ্চ আদর্শ নিষ্ঠা, সত্যপরতা — এ সব আপনা থেকে আসে না, এই সমস্ত গুণই খুব ছোটো থেকে জাগিয়ে তুলতে হয় আর তার অর্থ নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দৃঢ় ও অটলভাবে এগিয়ে দিতে হয় তাকে।

মানুষ করে তোলার ব্যাপারে উদ্দেশ্যের পরিচ্ছন্নতা যে একটা পথপ্রদর্শক আলোর মতো তার আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। লেনিনগ্রাদের একটি শিশু গ্রন্থাগারের পরিচারিকা পাঁচ সন্তানের জননী এলমা গুমভলত্ লিখেছেন: 'আমি জানতাম যে উদ্দেশ্যটা কী এটা না জানলে কোনো কাজই উৎরোয় না, তাই আমার ছেলেপিলেদের মানুষ করে তোলার মূল ধারাটা আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম।' 'সংসারের মধ্যে শিশু লালনের অভিজ্ঞতা' (শিক্ষণবিদ্যা আকাদমি কর্তৃক প্রকাশিত, মস্কো ১৯৫৯) পুস্তকে তিনি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন কী ভাবে প্রতিদিন নিয়ম করে চলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে উচ্চ নৈতিক গুণ জাগিয়ে তুলতে পারা যায়। এ রূপ সংসারের গোটা জীবনটাই শিশু মানুষ করার কর্তব্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট। সে পরিবার হল মিলমিশ পরিবার, তার প্রতিটি সদস্যই সানন্দে কাজ করে সাধারণ হিতার্থে — বলা বাহুল্য সেটা সম্ভব হয় কেবল দৈনন্দিন শিক্ষাদানমূলক কাজের ফলেই। 'ছেলেমেয়েরা যাতে অনুভব করতে পারে যে তারা যৌথের পূর্ণাধিকারী সদস্য সেজন্য আমার দাবিটা আমি সবসময় এমন ভাবে হাজির করার চেষ্টা করতাম যাতে শিশু বুঝত কী করতে হবে, কী ভাবে করতে হবে, সকলের সাধারণ স্বার্থের জন্য সে কাজটার গুরুত্ব কী, আদেশটা সাগ্রহে পালন করার আবশ্যিকতা বিষয়ে তার মনে এতটুকু কোনো সন্দেহ থাকত না।'

মা-বাপের আদেশ নিয়মিত পালন করায় যাতে ছেলেমেয়েদের স্বকীয় উদ্যোগ নষ্ট না হয় সেটাও মা লক্ষ্য রেখেছিলেন। যৌথের হিতে শ্রম — এটা হয়ে উঠেছিল তাদের অভ্যাস এবং তাতে স্বাধীন উদ্যোগ প্রদর্শনে সাহায্যই হত। মা লিখেছেন, 'আমি ছেলেদের এমন ভাবে মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলাম যাতে কোনো মুশকিলেই তারা ভয় না পায়, কাজটাকে পুরুষের কাজ আর মেয়েলী কাজ এভাবে ভাগ না করে।' গুমভলত্ যেসব দৃষ্টান্ত

দিয়েছেন তা থেকে দেখা যায় যে কোনো কাজের প্রতিই তাঁর ছেলেদের সত্যিই কোনো রকম ঘেন্না নেই। ছেলেরা সানন্দেই ছোটো বোনটির পরিচর্যা করে, কাপড় কাচা, রান্না বান্না, ঝাড়া মোছায় সাহায্য করে মাকে, বলতে কি তার ভেতর দিয়ে প্রচুর সক্রিয়তা ও উদ্যোগও দেখায়।

সংসারের কাজ যদি ঠিক মতো গোছানো যায় তাহলে তার প্রতিটি সভ্যের পক্ষেই বিশ্রাম এবং নিজের নিজের সখের কাজের মতো সময় বেশ থাকে। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে এ সংসারের মা স্কুলের সামাজিক কাজ এবং সঙ্গীত চক্রে অংশ নেবার মতো সময় পেয়ে থাকেন। ছেলেদের খেলাধুলোয় যোগ দেন তিনি, রবিবারে তাদের সঙ্গে শহরের বাইরে বেড়াতে যান। মায়ের কাজ বহুমুখী হলে ছেলে মানুষ করে তোলার পক্ষে তার তাৎপর্য হয় অনেক। দেখা গেছে এ সব ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা মায়ের শ্রমকে বেশি শ্রদ্ধা করে।

গুমভলতের পরিবারে স্বার্থপরতার স্থান নেই — পরস্পরের প্রতি যত্নই হল এ যৌথের মূল বৈশিষ্ট্য। 'আমাদের ছেলেমেয়েরা কখনো নিজে থেকে মিষ্টি, হাত খরচা বা পোষাক আশাকের ঝোঁক ধরে না। তারা ভালোই জানে, যথাসম্ভব যেটা প্রয়োজন সেটা তারা এমনিতেই পায়।'

দুঃখের বিষয় কোনো কোনো পরিবারে মা-বাপ এ হিসেব রাখে না কী ধরনের সন্তান তারা মানুষ করে তুলতে চায়, ছোটো থেকেই কোন চরিত্রগুণ তারা গড়ে তুলতে চায় তার মধ্যে।

এধরনের মা-বাপের কোনো পরিষ্কার উদ্দেশ্য নেই, তাদের লালন পালনের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সঙ্গতি নেই। সন্দেহ নেই যে সেরূপ ক্ষেত্রে তার ফল সর্বদাই হবে দৈবের অধীন, কেননা কী অর্জন করতে চাইছি সেটা জানা না থাকলে কোনো কাজই সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়।

নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসারে লালন করার বদলে এই ধরনের মা-বাপেরা একেবারে অন্ধের মতো চলে। কিছু কিছু মা-বাপ এও ভাবে যে সন্তান-বাৎসল্য ও তাদের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ, বিশেষ করে যদি তাতে মা-বাপের পক্ষ থেকে 'আত্মোৎসর্গের' প্রয়োজন হয়, নিতান্ত যা আবশ্যক তা থেকেও নিজেদের বঞ্চিত করতে হয় তবে সেই হল জনকজননীর কর্তব্য। এই ধরনের অভ্যাসের সর্বনাশা ফল ফলতে বিলম্ব হয় না।

নিজে নিজেই পোষাক পরি

মাঝে মাঝে এই ধরনের দৃশ্য চোখে পড়বে।

ছেলেমেয়েরা যেখানে খেলাধূলা করে সেই স্কোয়ারে তরুণী মহিলা বেঞ্চে বসে তার পাশের জনকে বলছে:

'দেখছেন তো, ঐ তো একটা পুঁচকে খুকি, অথচ স্বামীর রোজগারের মোটা অংশ যায় ওরই পেছনে।'

'সে কী?' অবাক হয় পাশের জন।

'আমাদের সংসারে রেওয়াজ হল "সবকিছু শিশুর জন্যে",' সগর্বে বলে তরুণী মা। 'আর আমরা যা খাই তা আল্লোচকা মুখেও তুলবে না। আর পোষাক কত... নিজেদের পরবার নেই কিন্তু প্রতিটি পালপার্বণে ওর জন্যে চাই নতুন পোষাক। খুকির আবার মন ওঠে না, পোষাকটি যদি তার সবার সেরা না হয়, তাহলে তার সব উৎসব মাটি। কোণে গিয়ে মুখ ভার করবে। ছেলেমেয়েদের একটু আনন্দে না রাখার কী আছে। লোকে এই কথাটা ঠিক বোঝে না, সাজের ঘটা সব নিজেরাই করে।'

'কী, নিজের একটা নতুন পোষাকের সাধ হয় না আপনার?' সঙ্গিনীর ফ্যাকাশে পোষাকের দিকে চট করে চেয়ে জিজ্ঞেস করে পাশের জন।

'কী যে বলেন। নিজের কথা আমি ভাবি না। নিজের ছেলেটি সবার সেরা, সবার নজর পড়ছে তার দিকে, এর মতো সুখ কি আর হয়। আনন্দ করেই আমি নিজেকে বলি দিতে রাজী। এ যে আমার মাতৃকর্তব্য।'

আলাপ কেটে গেল খোদ আল্লোচকার আবির্ভাবে। তার মিষ্টি মুখখানা কান্নায় ভার, 'য়ুর্কার সাইকেল আছে, আমার নেই কেন, এ্যাঁ!' রাগ করে মায়ের দিকে ঝাঁপিয়ে এল খুকি।

'বাবাকে বলিস, য়ুর্কার চেয়েও ভালো সাইকেল তোকে কিনে দেবে।'

'এক্ষুণি কিনে দাও আমায়, এক্ষুণি। চলো, কিনে দাও।' অধীর হয়ে পা ঠুকতে লাগল খুকি, তার নাকি স্বরটা বেড়ে উঠল একটা অশ্রুহীন প্রবল কান্নায়। ভয়ানক ঝোঁক ধরল সে, মাকে চড় চাপড় মারতে লাগল। আল্লোচকার চিৎকার আর কান্নায় অন্য ছেলেমেয়েরাও ঘিরে এল চারপাশে।

বিব্রত মা খুকির হাত ধরে তুষ্ট করতে লাগল, নিজের নিরানন্দ 'মাতৃকর্তব্য' পালন করতেই বুঝি গেল সে। সঙ্গিনী করুণা ভরে চেয়ে রইল তার দিকে।

কত ছেলেমেয়েই ভুল পথে যায় শুধু এই কারণে যে সন্তানের দাবি দাওয়াটাকে একটা যুক্তিসিদ্ধ সীমার মধ্যে রাখার চেষ্টা করেনি তার মা-বাপে। স্কুলে এবং মা-বাপের জীবনে কত কষ্ট ও দুঃখই না আনে সেই সব ছেলেমেয়ে যারা নিজের আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করার শিক্ষা পায়নি, মা-বাপের যুক্তিযুক্ত দাবির কাছে, যৌথের স্বার্থের কাছে নিজের ইচ্ছাকে নত করতে শেখেনি।

অনেক মা-বাপে বৃথাই ভেবে থাকেন যে ছেলের স্বভাব বড়ো হয়ে আপনা থেকেই শুধরে যাবে। তা হয় না। এমন কি তিন চার বছর বয়েসেও শিশুর যে আচরণ সেটা তার লালন পালনের ফল এবং সে পালনের পদ্ধতি যদি না বদলানো হয় তাহলে শিশুকালেই গড়ে ওঠা সে চরিত্র পাকা হয়েই যাবে। আলোচকার স্বভাবের সংক্ষিপ্ত যে বিবরণ পাওয়া গেল তা থেকে এখনই তার ভবিষ্যৎ স্বভাব চরিত্র বেশ কল্পনা করা যায়।

'মা-বাপের বই' রচনায় মাকারেঙ্কো খুব ভালোভাবেই দেখিয়েছেন এই ধরনের 'চিন্তাহীন' লালন পালনের ফল কী দাঁড়ায়।

ভেরা ইগনাতিয়েভনা করোবভা হলেন একজন গুণী, কর্তব্যপরায়ণা গ্রন্থাগারিকা। নিজের ছেলেমেয়ে পাভেল আর তামারাকে ভারি ভালোবাসেন তিনি। কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে তিনি একাই বাসন মাজেন, ঘরধোর সাফ করেন, সকলের জন্য রাঁধেন বাড়েন, আর কেবলি ভাবেন কী করে তাঁর সুন্দরী মেয়েটির শখ মেটাবেন, যা সংসারের আর্থিক সম্ভাবনার বাইরে। ভেরা ইগনাতিয়েভনা নিজেও এখনো যুবতী, কিন্তু সেই একজোড়া জীর্ণ জুতো আর রিপু করা পোষাকেই তিনি দিনের পর দিন চালাচ্ছেন। তামারার কিন্তু এসবে কোনো আগ্রহ নেই।

'তুই আজকেও কলেজে যাসনি?' জিজ্ঞেস করলেন ভেরা ইগনাতিয়েভনা।

তামারা জানলার কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ব্যাজার মুখে বললে, 'না।'

'কলেজে যাচ্ছিস না কেন বল তো?'

'কী পরে যাব?'

'কিন্তু কী করি বল, তামারা?'

'তুমিই জানো কী করতে হবে।'

'ঐ সেই জুতো বুঝি?'

'হ্যাঁ, জুতো।'

তামারা ঝট করে মায়ের দিকে ফিরে হড়বড় করে চেঁচিয়ে বলে গেল:

'বাদামী পোষাকের সঙ্গে গোলাপী জুতো পরে কলেজে যাই তাই চাও তো তুমি? দেখে লোক হাসুক তাই চাও তো? এ্যাঁ? তাই চাও তো? সোজাসুজি তাই বললেই পারো।'

'তামারা, কিন্তু তোর তো অন্য পোষাকও আছে। কালো জুতোও আছে, আরেক জোড়া। কলেজের ছাত্ররা সবাই তো আর অমন রঙ নিয়ে চুলচেরা বিচার করে না।'

তাতে রাগ আর ঝঙ্কার আরো চড়েই গেল। 'তামারা, কথা শোন, দ্যাখ, আমি কী পরে যাই।' মায়ের এই ভীরু স্নেহময় ভর্ৎসনায় মেয়ে ক্ষেপে উঠল:

'তার মানে, আমাকেও তোমার মতো বেশ নিতে হবে নাকি? তুমি তোমার কাল যা কাটাবার কাটিয়েছ। আমার এখন এইত বয়স, এই আমার ভোগ করার সময় ... মা-বাপের এখন উচিত ছেলেমেয়েদের জন্যে বাঁচা, সবাই একথা জানে, কেবল আমাদের বাড়িতেই কেন জানি কেউ বোঝে না।'

ভেঙে পড়া মার পক্ষে মেয়েকে এটুকু বোঝানোও সম্ভব হল না যে, সমাজতান্ত্রিক স্বদেশ ছেলেমেয়েদের যে যত্ন দিয়ে ঘিরে রাখে সেটা তাদের কেবল উদাসীন স্বার্থপর ও মা-বাপের সুখের 'দাবিদার' করে তোলার জন্য নয়। মেয়ের এই সরোষ আক্রমণটাকে জননী কর্তব্যের ঘাটতি হিসাবে মাতৃভূমির কাছে নিজের অপরাধ বলে নয়, বরং মেয়ের বেহিসেবী দাবি মেটাতে পারছেন না বলে, মেয়ের কাছেই নিজের অপরাধ বলে তিনি গ্রহণ করলেন। মেয়েও সেই ভাবেই বুঝেছিল। তাই মায়ের সঙ্গে মেয়ের এই ব্যবহারই হয়ে উঠেছিল একটা রীতি, নিত্যকার ব্যাপার।

ভেরা ইগনাতিয়েভনার ব্যবহারে ছেলেমেয়েদের মানুষ হয়ে ওঠার ওপর কী প্রভাব পড়বে সেই দিক থেকে তিনি কখনো তাঁর আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখেনি। তাঁর ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে সুন্দরী তামারার ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে মনে হত যেন কী এক ঐকান্তিক সুখে ঝলমল করছে। ছেলেমেয়েদের কেবল আদরই দিয়েছেন মা, কখনো এ হিসাব নেননি কী হয়ে গড়ে উঠবে এই ভবিষ্যৎ নাগরিকেরা।

পরিষ্কার উদ্দেশ্য না থাকায় লালন পালনের একটা পরিষ্কার পদ্ধতিও থাকা সম্ভব ছিল না।

করোবভদের পরিবারে সংসারের সব বোঝাই ছিল মায়ের ঘাড়ে। বাপ ঘরে ফিরত, খেত, কিন্তু কোনো ব্যাপারেই মাথা দিত না, ভাবত ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলাটা বউয়ের কাজ। ছেলেমেয়েরা বুঝত কেবল নিজেদের চাহিদা আর দাবি, কোনো রকম দায়িত্ব ছিল না তাদের। মায়ের জন্যে

কখনো তারা অপেক্ষা করে থাকেনি, তাঁকে নিজেদের সাফল্যে হঠাৎ খুশি করে দেওয়ার চেষ্টা করেনি, মা ফিরলে কোনো দিন নিজেরা ভালোমন্দ খাবার এগিয়ে দেয়নি। তাঁকে বিশ্রাম করতে দিয়ে, তাঁর নিদ্রায় ব্যাঘাত না করে ধোয়া পাকলা ও সাংসারিক কাজটুকু নিজেরা সেরে নেয়নি। কী ভাবে মা কাজ করেন এ নিয়ে ছেলেদের কোনো আগ্রহ ছিল না, জানত না তাঁর আর্থিক অবস্থার কথা, সংসার চালাবার ব্যাপারে কোনো রকম অংশ নিত না, অথচ কেবলি এটা ওটা দাবি করে চলত। ছেলেমেয়েরা যেখানে নিজেদের যৌথ সদস্য বলে ভাবছে না, ভাবছে কোন এক নবাবপুত্তুর বলে, যার তুষ্টির জন্য মা তাঁর নিতান্ত প্রয়োজনটুকুও বর্জন করছেন, তাকে কি কখনো পরিবার বলা সম্ভব?

মাকারেঙ্কো খুব ভালো করেই দেখিয়েছেন যে এই ধরনের পারিবারিক সম্পর্কের সঙ্গে সোভিয়েত সংসারের পারিবারিক যৌথ সংগঠনের কোনো মিল নেই। অত্যন্ত ন্যায্য রোষ ও ক্ষোভে তিনি লিখেছেন:

'তেমন লোক আমাদের দরকার নেই যারা মায়েদের মূক তিতিক্ষায় লালিত, তাঁদের অনন্ত আত্মদানে স্ফীত... মায়েদের আত্মবলির ওপর বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের দিন কাটানো সম্ভব কেবল শোষণের সমাজে।'

'আমাদের কোথাও কোথাও মায়েদের আত্মবলির যে অভ্যাস আছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত। অন্য স্বেচ্ছাচারী আর উৎপীড়কের অভাবে এই সব মায়েরা নিজেরাই তাদের গড়ে তুলছেন নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে। আমাদের মায়েদের কর্ম ও জীবন চালিত হওয়া উচিত অন্ধ স্নেহবশে নয়, সোভিয়েত নাগরিকত্ব বোধের বৃহৎ প্রচেষ্টায়। সেই মায়েরাই আমাদের দেবেন চমৎকার সুখী মানুষদের আর তাঁরা নিজেরাও শেষাবধি সুখ বোধ করে যাবেন।'

মা-বাপে মাঝে মাঝে লালন পালনের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রাখেন বটে, তবে সেটা হয়ে দাঁড়ায় একপেশে, যেখানে ছেলেমেয়েদের পাওয়া চাই সর্বাঙ্গীন — শ্রম, দেহ, মানস, নীতিবোধ ও সৌন্দর্যবোধের শিক্ষা।

একটি পরিবারে ছয় বছরের একটি ছেলেকে আমরা পর্যবেক্ষণ করি। ছেলেটি গুণী, সঙ্গীতের প্রতিভা আছে। কিন্তু তার এই গুণটার বিকাশই

অন্য সমস্ত শিক্ষার উপর প্রাধান্য পায়। পরিবারের মধ্যে সকলের ওপরেই ছিল ওর অটুট আধিপত্য। পরিবারের অন্য সকলের কাছে ওর ইচ্ছেই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালো পোষাকটা, ভালো ঘরটা, ভালো খাবারটা — সব তার জন্যে। নিজেরা বহু জিনিসে আত্মত্যাগ করে মা-বাপে তার জন্যে সেরা শিক্ষকের ব্যবস্থা করেছেন। এটা তার কাছে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে ছেলেটি কখনো কিছুর জন্যে মিনতি করে না, দাবি করে। মা-বাপ দিদিমার সঙ্গে তার আচরণ প্রায়ই অশোভন, এমন কি কর্কশ।

লোকে বলত, 'ছেলেকে অমন লাই দিতে নেই, একটা সীমা রাখা উচিত।'

'কী যে বলেন! কী যে বলেন! সীমা মানে! এটা বুঝতে পারছেন না যে ছেলেটি অসম্ভব প্রতিভাশালী।'

সংসারের সবকিছুই ছিল ছেলেটির রুটিন অনুসারে।

'চুপ চুপ। আস্তে! সিরিওজা বাজাচ্ছে।'

'আস্তে! সিরিওজা ঘুমুচ্ছে!'

হয়ত ওর প্রতিভা সত্যিই অনেক বিকশিত হবে কিন্তু ভবিষ্যৎ নাগরিকের পক্ষে সেইটাই সব নয়।

এই ধারায় লালন পালনের ফল কী হতে পারে দেখুন।

কেতভদের পরিবারে ছেলে মানুষ করার সবকিছু পরিস্থিতিই বর্তমান ছিল: বুদ্ধিমান সানন্দ মা-বাপ, দুজনের মধ্যে বেশ ভালোবাসা, ছেলেটিও স্বাস্থ্যবান, গুণী, মা-বাপের দুজনেরই ইচ্ছে ছেলেটিকে গড়ে তুলবে এক 'বড়ো মানুষ নাগরিক', 'জীবনের মণি করে'। তাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গিত হল ছেলেটিকে একটি কেউকেটা করে তোলার জন্য, তার জন্যই ব্যয় করা হল তাদের সমস্ত মানসিক ও দৈহিক শক্তি। ছেলেটি বেশ বোঝে যে সেই হল সংসারের নয়নমণি, মা-বাপে তার চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে দুটি 'অসহায় উপগ্রহের' মতো। তার পরিণতি কী দাঁড়াল? ছেলেটি প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ হলেও সুপুত্র হল না, সুনাগরিক হল না।

মাকারেঙ্কো তার এই টিপিক্যাল দৃশ্যটি বর্ণনা করেছেন। বাপের ভারি অসুখ, মা শোকে মুহ্যমান, রোগশয্যার পাশে বসে আছেন সার্জন, জরুরী অপারেশন করতে হবে, কিন্তু বাপের অবস্থা নিয়ে ছেলের বিশেষ মাথাব্যথা নেই।

মা-র কাজটা করে দিই

'নিজের ঘরখানা থেকে বেরিয়ে ভিক্তর এগিয়ে গেল সদর দরজার দিকে। রান্না ঘর থেকে মা ছুটে গেলেন তার দিকে, ক্লান্ত কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "ভিক্তর, ডাক্তারখানায় একবার যাবি বাছা?.. ওষুধটা এতক্ষণ তৈরি হয়ে গেছে, দামও দেয়া আছে... খুব জরুরী..."

'বালিশের ওপর আলুথালু চুলে ভরা মাথাটা ফিরিয়ে পিওতর আলেক্সান্দ্রভিচ ছেলের দিকে তাকিয়ে কষ্ট করে হাসলেন। পেটের আলসার সত্ত্বেও সাবালক প্রতিভাবান ছেলেকে দেখে সুখ হয় বৈকি। ভিক্তরও মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসল, "উঁহু, সময় নেই, আমায় এক জায়গায় যেতে হবে। চাবিটা নিলাম, ফিরতে দেরি হতে পারে।"'

বাপের স্বাস্থ্য এবং উদ্বিগ্ন মায়ের অনুরোধের প্রতি এই উদাসীনতায় কী নির্লজ্জ স্বার্থপরতাই না ফুটে উঠেছে। কিন্তু বাপ-মায়ের প্রতি ছেলেটির এই আচরণে এ পরিবার এতই অভ্যস্ত যে মা-বাপ এবং প্রতিভাবান পুত্র কারো কাছেই এটা একটুকু অস্বাভাবিক মনে হল না, যদিও বাইরের লোক তাতে একেবারে হতভম্ব বোধ করেছিলেন।

'সার্জন চেয়ার ছেড়ে ধেয়ে এলেন তার দিকে। জানি না, কী করতে চেয়েছিলেন, মুখটা তাঁর বিবর্ণ। যাই হোক উত্তেজিত স্বরে সিধেভাবেই তিনি বললেন, "আহা, ওকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী? ওষুধটা তো আমিও নিয়ে আসতে পারি। কতটুকু আর ব্যাপার!"

'বাইরে ভিক্তর অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য।

'বললে, "আপনি সম্ভবত অন্য দিকে যাবেন? আমি যাচ্ছি সেণ্টারে।"

'"অবশ্যই অন্য দিকে," এই বলে ডাক্তার বেগে নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে।'

পরিবারের মধ্যে এই রকম সম্পর্ক থাকলে উত্তম নাগরিক গড়ে তোলা অসম্ভব। ভিক্তর কমসমল সংগঠন থেকে খসে যায়, খারাপ কমরেড হয়ে ওঠে, নিজের বৈজ্ঞানিক কাজকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে সামাজিক কার্যকলাপ থেকে।

পরিবারের কাছে শিক্ষণবিদ্যার একটা দাবি হল **পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক সাহায্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক শ্রমযৌথের একটা সঠিক সংগঠন।**

সোভিয়েত পরিস্থিতিতে সেরূপ সংগঠন প্রত্যেক পরিবারের পক্ষেই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কেবল এই পরিস্থিতিতেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ, সংহতি বোধ, পরস্পর সাহায্য ও যৌথভাব প্রভৃতি যে গুণগুলি মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক তা গড়ে তোলা যায়। এই সব গুণ জাগিয়ে তোলার জন্য অতি ছেলেবেলা থেকেই প্রত্যহ এমন একটা পরিস্থিতি গড়ে তোলা অপরিহার্য যাতে যৌথাভ্যাস হয়ে ওঠে স্বাভাবিক আচরণের একটা অচ্ছেদ্য অংশ, যাতে সে ধরনের কাজ ভেবে চিন্তে সচেতনভাবে করা হচ্ছে তাই নয়, তা পুরোপুরি একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, হয়ে উঠেছে মানুষের প্রকৃতিগত। স্কুলে যাবার মতো বয়স হবার আগে শিশুর জন্য সে পরিস্থিতি সর্বাগ্রে গড়তে হবে পরিবারকে।

ভেতকিনদের বহু ছেলেমেয়ের সংসারে এরূপ সংগঠনের চমৎকার একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মাকারেঙ্কো।

ভেতকিন ছেলেপিলেরা গরম কালের জন্য একটা বারান্দা বানাচ্ছে। বাপ শুধু কাজটার ওপর নজর রেখেছে, কেননা দিনে তাকে কাজ করতে হয় স্মিদি শপে। জিনিসটার মূল কাজগুলো করছে বড়োরা, যাদের সবার ওপরে

পনের বছরের ছেলেটি। কিন্তু ছোটোরাও দায়িত্ব নিয়ে নিজের নিজের কর্তব্যটুকু করছে। ছোটোদের কাজ বর্ণনা করেছে বাপ এই বলে, 'ভাসকা আট বছর, তাছাড়া লিউবার সাত বছর, কোলকার ছয় বছর। ওদের দিয়ে বেশি কিছু হবে না, তাহলেও শিখুক: এটা ওটা নিয়ে আসুক, দোকানে ছুটুক...

' "মালমসলাগুলো ওরাই বয়ে আনছে?"

' "হ্যাঁ ওরাই — ভাসকা, লিউবা আর কোলকা, এটা ওদের কাজ।" '

পাঁচ বছরের মারুসিয়াও বেকার নয়। আট বছরের দলপতি তাকে দিয়েছে এক দায়িত্বপূর্ণ কাজ: পেরেকওয়ালা তক্তা থেকে পেরেক-ছাড়া তক্তা বেছে রাখা। এ কাজ সে পালন করেছে দায়িত্বের সঙ্গেই: 'প্রতিটি তক্তা সে মন দিয়ে দেখেছে, সন্দেহজনক প্রতিটি দাগে সে হাত বুলিয়েছে, আর এমনিতেই ফুলো ফুলো গাল দুটো আরো ফুলিয়ে তক্তাগুলো বেছে বেছে রেখেছে দুই ভাগে। কাজের সময় সে আপন মনে বকবক করেছে: "পেরেক আছে... পেরেক নেই... পেরেক... তিনটে পেরেক... আর এটায়... পেরেক নেই। এটায়... পেরেক।" কেবল মাঝে মাঝে সে তক্তার সঙ্গে আঁটা কোনো সন্দেহজনক তারের মতো জিনিস দেখলে ভানকা কি ভিতকার কাছে গিয়ে বিমর্ষ প্রশ্ন করেছে, "এটাও কি পেরেক? নাকি পেরেক নয়?" '

যৌথের এই পাঁচ বছরী সদস্যেরও কর্তব্য পালনে কী না দায়িত্ববোধ, কী রকম গোছগাছ শৃঙ্খলাবোধ! সুশৃঙ্খলা আর দায়িত্ববোধ — এ হল এ পরিবারের ছেলেমেয়েদের বৈশিষ্ট্য। ভেতকিনদের রান্নার ব্যাপারটা দেখা যাক। সবকিছুই চলে মসৃণভাবে, নিশ্চিন্তে, চটপট। সবাই হাসিখুশি, সবাই নিজের নিজের কাজটা করে যাচ্ছে নিশ্চিন্তে।

' "ভানিউশকা, দে এবার," বলে সাত বছরের লিউবা। বাদামী চোখ, রুক্ষ চেহারার ভানিউশকা আলমারির কাছে গেড়ে বসে নিচের সেল্ফ থেকে দিতে শুরু করে প্রথমে স্লাইস করা রুটির ঝুড়ি, তারপর সুপ প্লেট, কয়েকটা ছুরি, দুটো নুনদানি আর আলুমিনিয়মের চামচ। ভাইটির শান্ত কাজটার পর ওদিকে টেবিলের চারপাশে শুরু হল বোনটির তোলপাড় করা কাজ; যেন একটা উষ্ণ হাওয়ার ঝলকই বয়ে গেল।'

পরিবারের মধ্যে পরিচালক ভূমিকাটা মা-বাপের।

পরিবারের মধ্যে ছেলেদের সঠিক পালনের একটা মূল সর্ত হল **বাপ-মায়ের প্রতিষ্ঠা** অর্থাৎ বাপ-মায়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা, যার ফলে ছেলেমেয়েরা তাদের কথা অটলভাবে বিশ্বাস করবে, কোনো রকম জবরদস্তি ছাড়াই তাদের বাধ্য হবে, সশ্রদ্ধে ও সগর্বে তাদের অনুকরণ করবে। এই প্রতিষ্ঠা ছাড়া পরিবারের মধ্যে ছেলেদের সঠিক লালন সম্ভব নয়, যেমন তা কিণ্ডারগার্টেনেও সম্ভব নয় যদি ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষকের প্রতিষ্ঠা না থাকে।

মা-বাপের প্রতিষ্ঠার মূলকথা হল তাদের উচ্চ নৈতিকতা, সৎ পরিশ্রম, দেশপ্রেম, ন্যায্য কঠোরতা সহ ছেলেমেয়েদের প্রতি স্নেহ, একটা মিলমিশ সাংসারিক যৌথ গড়ে তোলার দক্ষতা।

মনোযোগী, স্নেহশীল, দরদী ও সেই সঙ্গে কঠোর পিতামাতার স্মৃতি বহু ছেলেমেয়ে সারা জীবন ধরে বহন করে। রুশী শিক্ষণবিদ্যার মহা গুরু উশিনস্কি ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলার ব্যাপারে শিক্ষাদাতার উচ্চ নৈতিকতার দিকে সঠিকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, 'ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে ওঠে, তাদের মানসিক ও নৈতিক গুণ বিকশিত হয় কেবল মানবিক ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এবং কোনো ঠাট কোনো শৃঙ্খলা, কোনো নিয়মাবলী এবং পাঠ্যানুশীলনের কোনো রুটিনেই কৃত্রিমভাবে এ ব্যক্তিত্বের প্রভাবের স্থান নিতে পারে না। এ হল তরুণ অন্তরের পক্ষে সূর্যের কিরণের মতো, তার বদলি অসম্ভব।'

খুব একটা সুদৃঢ় যৌথ ও বাপ-মায়ের প্রতিষ্ঠার একটা মূল সর্ত হল **বাপ-মায়ের পারস্পরিক** শ্রদ্ধা। মা-বাপের একজন যাতে অপর জনের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়ে তোলে, ছেলেমেয়েদের কাছে তার পরিশ্রম ও সামাজিক কাজকর্মের তাৎপর্য দেখিয়ে দেয়, এটা খুব জরুরী। কিণ্ডারগার্টেনে ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রায়ই আলাপ চলে, কার মা-বাপ কোথায় কাজ করে এবং কী তার তাৎপর্য। সেখানে শিক্ষিকারা প্রায়ই দেখেছেন যে সব ছেলেমেয়ের মায়েরা সংসার নিয়ে থাকে, তারা নিজেদের হীন বোধ করে। 'আমার মা কাজ করে না,' নিচু বিমর্ষ গলায় বলে ছেলেটি, 'কেবল বাড়িতেই বসে থাকে।'

এ ব্যাপারে মা-বাপেরাই অনেকখানি দোষী। বহু ছেলেমেয়ের সংসারে মা যদি সাংসারিক যৌথটার সংগঠক হয়, সংসারের সাধারণ কাজে ছেলেমেয়েদের সক্রিয়ভাবে টেনে আনে, স্বামী যদি তাকে সাহায্য করার

চেষ্টা করে ও ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে দেয় মা কত খাটে তাহলে মায়ের মেহনতকে শ্রদ্ধা না করার কোনো কারণ থাকবে না ছেলেমেয়েদের।

দুঃখের বিষয় কিছু কিছু পরিবারে এই ধরনের অশ্রদ্ধার উপাদান দেখতে পাওয়া যায়।

পাভেল ইভানভিচ মার্কভ বর্ণনা করেছেন:

'আমি কাগজ পড়ছিলাম, আর আমাদের বাচ্চারা কোলিয়া, পোলিয়া আর মানিয়া তাদের কোণটিতে "সংসার-সংসার" খেলছিল। আমি কান পেতে শুনতে লাগলাম।

'"চল সোনিয়া, সংস্কৃতি পার্কে যাই, কাজের পর একটু বিশ্রাম করা যাবে," বললে 'বাপ'।

'বড়ো ভাইয়ের ভূমিকা নিয়ে কোলিয়া বললে, "মার জন্যে একটু দাঁড়াই।"

'"আহ, ওর সময় হবে না, পিঠে ভাজছে। ওর বিশ্রামের দরকার নেই, ও তো আর কাজে যায় না।"

'"বেশ তো যাও না তোমরা," মায়ের ভূমিকায় আপোসের সুরে বলে মানিয়া, "তোমরা একটু জিরিয়ে নাও গে, আমার পিঠে ভাজাও ততক্ষণে শেষ হয়ে যাবে, গরম গরম খাওয়া যাবে।"

'ছেলেমেয়েদের এই কথাবার্তায় আমার চিন্তা হল। নিজের কাছে এই প্রশ্ন করলাম, এদিক থেকে আমার সংসারের সবই কি ঠিক আছে?

'শনিবার সংসারের সবাই জুটেছে তখন আমি বেশ জাঁক করে বললাম, "আজ আমায় ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিতে ডেকেছিল, পরিকল্পনা অতি পূরণের জন্যে বিরাম ভবনে ছুটি কাটাবার একটা টিকিট দিয়েছে।" আমার সাফল্যের গর্বে ছেলেমেয়েরা সানন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। "টিকিটটা আমি নেব, কমিটিকে আমি বলেছি, তবে ওটা আমার নামে না লিখে আমার বৌ মারিয়া পেত্রভনার নামে লিখে দিন। ভালোভাবে কাজ করার ব্যাপারে সেই সাহায্য করে আমাকে আর সেমিয়নকে, ছেলেমেয়েরা যাতে ভালো পড়াশুনা করে সেটাও সেই দেখে। আমাদের সংসারের সমস্ত ব্যাপারটাই সেই চালায়, বেশ আরাম করে ছুটি কাটানোর সুযোগ তো তারই জন্যে।" টেবিলের ওপর টিকিটটা রাখলাম আমি। ছেলেমেয়েরা টিকিটের ওপর তাদের মায়ের নামটা

পড়লে সানন্দে। ওদের চোখে তার প্রতিষ্ঠা সহসা অনেক বেড়ে গেল। ওদের কাছে যখন তাদের বন্ধুবান্ধব এল তখন ওরা সগর্বে ঘোষণা করলে, "কারখানা থেকে আমাদের মাকে ছুটি কাটাবার টিকিট দিয়েছে, বাবাকে মা সাহায্য করে কিনা।"

'বিরাম ভবনে যাত্রার আয়োজন করছেন মা। "কিছু ভেবো না মা, তুমি না থাকলেও আমরা চালিয়ে নেব।" কিন্তু মা ছাড়া সবকিছু বেশ চলল তা নয়; বাঁধাকপির সুপে কখনো হয়ত নুন বেশি হয়েছে, আলু হয়ত কখনো কাঁচাই থেকে গেছে। মা যখন ফিরে এল, ছেলেমেয়েরা তখনো সাগ্রহেই সাহায্য করতে লাগল তাকে।

'পেতিয়া বলে, "ভেবো না মা, আমি তোমার কাঠ চ্যালা করে দেব, জল বইব।"

"ভেবো না মা, আমি এক্ষুণি বাসন ধুয়ে দিচ্ছি, ফুলগাছে জলও দিয়ে দেব," বলে পোলিয়া। তার বন্ধুরাও সাহায্য করতে কম আগ্রহী নয়।

ফুলের টবে জল দিতে হয় বৈকি

'মার অনুপস্থিতির সময় প্রত্যেকে টের পেয়েছিল কী প্রচণ্ড কাজ মাকে করতে হয় প্রতিদিন। বিরাম ভবন থেকে ফেরার পর আমরা সবাই মায়ের নিত্যকার মেহনতে সাহায্য করতে চাইতাম। লক্ষ্য করে দেখলাম আমাদের ভবিষ্যৎ পুরুষদের খেলার অর্থও পালটেছে। মানিয়ার কথার সুর এখন একেবারে অন্য রকম:

' "কোলিয়া, বাসন ধোবার সময় দুবার করে নয়, তিনবার করে ধোবে।" মায়ের মতই শান্ত ধীর স্বরে বললে সে।

' "সাবধানে ফুলে জল দিয়ো পোলিয়া।"

' "সেনিয়া, আর এক বালতি জল এনে দে তো।"

'নিজের সঙ্গিসাথীদের সে বলে, "টেবিল সাজা তো বাছারা, তোদের বাপ আসবে এবার, চটপট খেয়ে দেয়ে আমরা এক সঙ্গে বেড়াতে যাব সংস্কৃতি পার্কে।"

'কাগজের আড়াল থেকে আমি মন দিয়ে লক্ষ্য করতাম ওদের খেলা, মিষ্টি এই শিশু ভাষণ শুনতে ভালোই লাগল; ভাগ্যিস সময় থাকতেই শুধরে নিয়েছিলাম।'

শিশুদের মনে এই প্রত্যয় গেঁথে দিতে হবে যে প্রতিটি শ্রমই শ্রদ্ধেয়, প্রতিটি শ্রমই হল সাধারণ ভাণ্ডারে এক একটি অবদান। মানুষের মূল্য তার শ্রমের প্রকৃতিতে নয়, শ্রমের প্রতি তার সম্পর্কে। শিশুদের কাছে এটা দেখাতে হবে প্রত্যক্ষ উদাহরণ মারফত।

ইভান সেমিওর্নভিচ গলোভকিন বলেছেন:

'বড়ো ছেলেটি স্কুলে ভর্তি হল, ছোটোদের বয়স হয়নি, তাদের দেওয়া হল কিণ্ডারগার্টেনে। মা'টি গেলেন আমাদের কারখানায় ঝাড়ুদারের কাজে। মা যে মেশিনটুলে কাজ করছে না এতে মনে হল ছেলেরা ক্ষুণ্ণ। "দেখ না বাবা তুমি তো সব সময় তোমার পরিকল্পনা অতিপূরণ করো আর ঝাড়ুদার? কলঘর সাফ করবে, বাস!" বড়ো ছেলেটি বললে। "৮ই মার্চ নারী দিবসের দিন, কিণ্ডারগার্টনে আমি কী বলব মা-র সম্পর্কে?" জিজ্ঞেস করে মানিয়া।

'ছেলেমেয়েদের কাছে তাই দেখাতে হল যে তাদের মা ধমকের ভয়ে কাজ করে না, কাজ করে নিজের বিবেক মেনে, মন দিয়ে কলঘর সাফ করে ঠিক

নিজের বাসের ঘরখানার মতো। তার এই যত্ন আত্তির জন্যে তাকে ভারি ভালোবাসে মজুরেরা।

'বাড়ি এসে প্রায়ই বলতাম, "শুনছো গো, আজ কলঘরে ফের সবাই তোমার গুণগান করছিল। ফোরম্যান সেমিওন নিকিতিচ বলছিল, ক্‌সেনিয়া ইভানভনা আমাদের এখানে কাজে ঢোকার পর থেকে আমাদের কলঘরটি হয়ে উঠেছে একেবারে স্যানাটোরিয়মের মতো। তাজা বাতাস, ঝকঝকে তকতকে জানলা, একটি ধুলো বালি নেই, পরিকল্পনা অতিপূরণ হবে না তো কী?"

'ছেলেমেয়েদের মনে মাকে নিয়ে আর খুঁতখুঁতি রইল না, মা কী করেন সে বিষয়ে ক্লাসে কী বলতে হবে তা তারা জানত, বিশেষ করে মা আবার শ্রমিকদের শ্রমপরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য ৮ই মার্চের আগে পরিচালকমণ্ডলীদের কাছ থেকে পেলেন ধন্যবাদ পত্র এবং বোনাস।'

ছেলেমেয়েদের কাছে মা-বাপের মর্যাদা এবং শিশুদের সঠিক প্রতিপালনের অনিবার্য সর্ত হল **লালন পালন নিয়ে মা-বাপের মতৈক্য।**

একটা চিরায়ত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে — যেমন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের মা-বাবা ইলিয়া নিকলায়েভিচ এবং মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ব্যাপারে সর্বদা উভয়ের মতই ছিল এক রকম। পরিবারটি গড়ে উঠেছিল শ্রমশীলতার উপর। সংসার ছিল সুশৃঙ্খলার প্রতিমূর্তি এবং ছেলেমেয়েদের কাছে মা-বাপের মর্যাদা ছিল গভীর। বিশ্ব প্রলেতারিয়েতের এই নায়ক প্রতিভার জীবনী থেকে আমরা জানি, উলিয়ানভদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের জন্য কী রূপ অটুট যোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন, কী অপূর্ব নাগরিক গুণ অর্জন করেছিলেন তাঁরা, কী ভাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁরা মা-বাপের স্মৃতিকে পবিত্র জ্ঞান করেছেন।

প্রতি পরিবারেই এই ধরনের মতৈক্য থাকা দরকার। এব্যাপারে শুধু ওলেগ কশেভয় বা জোয়া ও শুরা কসমোদেমিয়ানস্কিদের মতো অমর বীরদের দৃষ্টান্ত নয়, এমন অনেক সাধারণ পরিবারেরও নাম করা যায় যেখানে ছেলেমেয়েদের লালন পালনের ব্যাপারে মা-বাপেরা একটা দৃঢ় পদ্ধতি মেনে চলেন, কাজ করেন এক মত হয়ে। কিন্তু অন্য রকম ব্যাপারও হয়।

জনকজননীদের এক সম্মেলনে প্রশ্ন এসেছিল, 'ছেলেমেয়েদের কাছে মা-বাপের একই রকম মর্যাদা থাকে না কেন? আমি কিছু একটা বারণ করলে মেয়ে দৌড়ে যায় বাপের কাছে, বাপও যদি বারণ করে, তবেই শোনে, কিন্তু বাপ যদি সায় দেয় তাহলে সে তার জিদ ছাড়ে না।'

এ প্রশ্নে অনেক জনকজননীই সাড়া দেন।

মজুর ই. সেমিওনভ বলেন, 'এ ব্যাপার কেন হয় তা আপনাকে বলি, শুনুন। মা-বাপের একেবারে এই কড়ার করে চলতে হবে যে একজন যেটা বারণ করবে অন্যজন কখনো সেটা মঞ্জুর করবে না। সে ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা কখনো বাপের কাছে কখনো মায়ের কাছে ধর্না দেবে না। আমার ছেলেমেয়ে পাঁচটি। প্রথমটি জন্মাবার পর মা প্রায়ই তাকে লাই দিত, আমার মত ছিল না। কিন্তু কখনো আমি সেটা ছেলেটির কাছে প্রকাশ করিনি, মায়ের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ করিনি। প্রথম প্রথম বৌয়ের সঙ্গে আমার বহু তর্ক হয়েছে, শিগগিরই শিশুর আচরণের প্রত্যক্ষ ঘটনাটা থেকেই বৌ বুঝেছিল লাই দেবার ফল কী দাঁড়ায়, এখন আর আমাদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য ঘটে না। ছেলেমেয়েরা মা-বাপকে সমানভাবেই শ্রদ্ধা করে।'

মা-বাপের মধ্যে মতৈক্য, পরস্পর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিয়েই সংসারের মূল সূরটি গাঁথা হয়ে যায় বটে। কিন্তু সাংসারিক যৌথটাকে লালন পালনের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ বলে তখনই ধরা যায় যখন সংসারের সকল সভ্যের মধ্যেই সে রূপ মনোভাব বর্তমান।

একটা পারিবারিক যৌথ গড়ে তোলার ব্যাপারে মা-বাপের প্রধান কর্তব্য হল **ছেলেমেয়েদের নিজেদের ভেতর সৌহার্দ্য ও পরস্পর সাহায্যের ভিত্তিতে একটা সঠিক সম্পর্ক সৃষ্টি করা।**

ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা বড়ো তাদের সঙ্গে ছোটোদের সম্পর্ক এমন ভাবে গড়ে তোলা আবশ্যক যাতে বড়োরা ছোটোদের দেখে তাদের উত্তরসূরী হিসাবে, তাদের অভিভাবকের কাজ করে, তাদের সাহায্য ও দৈনন্দিন যত্নের ভার নেয়।

একটি পরিবারকে পর্যবেক্ষণ করি আমরা, এখানে বড়ো দাদা কমসমল সভ্য, দিদিটি কিশোরী পাইয়োনিয়র, ছোটো ভাইবোনদের দেখা শোনা করাটা এরা কর্তব্য জ্ঞান করে। দাদা গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে এসে মহান জাতীয়
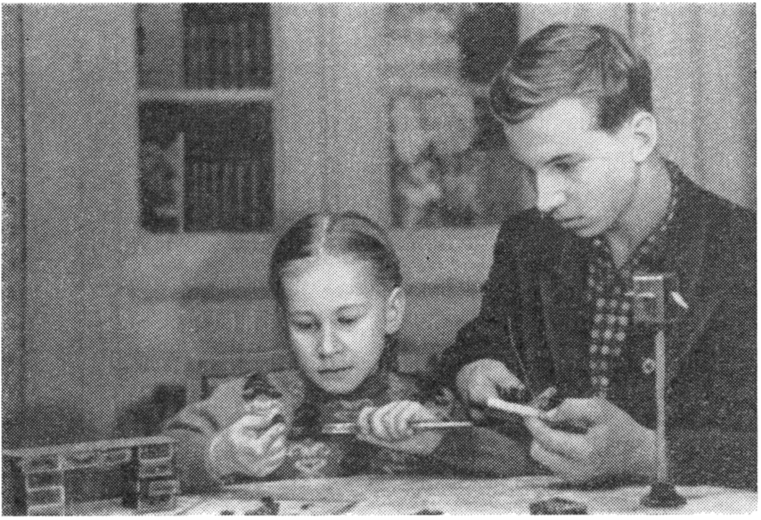
পুতুল বানিয়ে দেয় দাদা

নায়কদের, শ্রমবীরদের গল্প শোনাত। নিজের কাজকর্মের কথা বলত, তাদের নিজেদের তৈরি খেলনা বানাতে সাহায্য করত।

আর পত্রপত্রিকা থেকে ছবি কেটে কেটে অ্যালবাম বানাতে সাহায্য করত দিদিটি, পুতুলের সাজ সেলাই করে দিত, নকশা তুলতে শেখাত।

ছোটোদের সঙ্গে বড়োদের এই ধরনের সম্পর্কে দাদাদিদিদের প্রতি ভালোবাসা বেড়ে ওঠে ছোটোদের, তাদের অনুকরণ করতে শেখে তারা, খুশি করতে চায়।

বড়োদের সঙ্গে ছোটোদের এই ধরনের স্নেহ সম্পর্ক খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রায়ই তা নষ্ট হয় একটা মিথ্যা অহংকার বোধে। মা ছোটো ভাইটিকে একটু দেখতে বললে, স্কুল-পড়ুয়া ছেলেটি জবাব দিলে, 'আমি আর এখন ছোটো নই, কচিকাচাদের নিয়ে সময় নষ্ট করা পোষাবে না। আমার নিজেরই কত কাজ।' ছোটোদের প্রতি বড়োদের এই ধরনের বেঠিক মনোভাব শোধন করা উচিত। বড়োদের অবিরত বোঝানো দরকার যে ছোটোদের সঙ্গে খেলাধুলা করে, তাদের দেখাশুনা করে, নিজের আচরণ দিয়ে তাদের সামনে সুদৃষ্টান্ত

স্থাপন করে বড়োরা নিজেদেরই উত্তরসূরীর পথ করছে, সে ব্যাপারে সাহায্য করছে মা-বাপকে।

তবে বড়োদের অভিভাবকত্ব দিয়ে ছোটোদের সক্রিয়তা কোনো ক্রমেই রোধ করা উচিত নয়। ছোটোদের যা সাধ্য তেমন সবকিছুই তাদের নিজেদের করতে দিতে হবে।

আমাদের ছেলেমেয়েরা হল ভবিষ্যৎ মাতাপিতা, শিশু পালনে মা-বাপকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে যদি তারা শিশু মানুষ করার ব্যাপারটা শিখতে পারে তো খুবই ভালো কথা। যেমন তিন চার বছরের শিশুকে পোষাক পরিয়ে দেওয়া উচিত নয়, নিজে নিজেই তাদের পোষাক পরতে শেখা উচিত, তাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে দেওয়া উচিত নয়, নিজে নিজেই যাতে সে নিজের পোষাক আশাক নির্দিষ্ট একটা রীতি অনুসারে গুছিয়ে রাখে, তা শেখানো উচিত, তাদের খেলনা চৌখুপী কাঠগুলো দিয়ে কিছু করে দেওয়া উচিত নয়, দেখিয়ে দেওয়া উচিত কী ভাবে তা করতে হয়।

এর উল্টো দিকটাও পরিহার করা উচিত। এমন দৃষ্টান্তও চোখে পড়েছে যেখানে ছোটোদের মানুষ করার ব্যাপারে বড়ো ছেলেমেয়েদের সামর্থ্য বাপ-মায়ে খুব বাড়িয়ে দেখে এবং তাদের ওপর এত বেশি দায়িত্ব ও ভার চাপায় যে তাদের নিজেদের কাজ, যেমন পাইয়োনিয়র সদনে যাওয়া, রিহার্সাল, শিল্প চক্র ইত্যাদিতে হাজির হওয়া, খেলাধূলা করা বা একটা ভালো বই পড়া ইত্যাদির ক্ষতি হয়। এই ধরনের অত্যধিক বোঝা ন্যায়তই বিরক্তিকর এবং শেষ পর্যন্ত বড়োদের সঙ্গে ছোটোদের সঠিক সম্পর্ক তাতে ব্যাহতই হয়।

সংসারের সব সদস্যের মধ্যে পরস্পর মনোযোগ ও ভালোবাসা, ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরস্পর সাহায্য ও সৌহার্দ্যের ফলে পারিবারিক যৌথের মধ্যে এমন একটা মিলমিশ, আনন্দ ও সুখের পরিবেশ রচিত হয় যা ছেলেমেয়ের স্বাভাবিক বিকাশ ও সঠিকভাবে মানুষ করে তোলার পক্ষে অতি আবশ্যক। এই দিক থেকে মাকারেঙ্কো অতি গভীর এই সত্যই বলেছেন যে পরিপূর্ণ অর্থে একটা পরিবার হল কেবল সৌহার্দ্যপূর্ণ সুখী পরিবারই, যেখানে লোকেরা সুখী, পরস্পরের সুখ যেখানে তারা গড়ে তুলতে ও বাঁচিয়ে রাখতে পারে, কেবল সেই পরিস্থিতিতেই গড়ে ওঠে হাসিখুশি সুস্থ সবল শিশু।

জোয়া আর শুরা কসমোদেমিয়ানস্কিরা মিলেমিশে আনন্দ করে বেড়ে উঠেছিল পরস্পর শ্রদ্ধা প্রীতি ও মতৈক্যের এক পরিবেশে — এটা ছিল সে পরিবারের বৈশিষ্ট্য।

দূর সাইবেরিয়ায় এক গ্রামে স্কুলের শিক্ষকতা করতেন লিউবভ তিমোফেয়েভনা আর আনাতলি পেত্রভিচ, কী আন্তরিকতা কী শান্তি আর সুখেই না ভরে উঠত এ সংসারের সন্ধ্যা।

'জোয়া শুরার কাহিনী' গ্রন্থে লিউবভ তিমোফেয়েভনা কসমোদেমিয়ানস্কায়া লিখেছেন, 'দীর্ঘ সন্ধ্যাগুলো আমরা কাটাতাম একসঙ্গে, টেবিল জুড়ে বসে, নয়ত চুল্লির ধারে যেখানে চারধার গরম করে আগুন জ্বলত। ভারি সুন্দর ছিল সেই সন্ধ্যাগুলো! বলা উচিত যে সন্ধ্যেগুলো পুরোপুরি ছেলেমেয়েদের জন্যে আমরা দিতে পারতাম না; আমার, বিশেষ করে আনাতলি পেত্রভিচের অনেক কাজ থাকত রাতে সারার জন্যে। "কাজ" কথাটি আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে ছোটো থেকেই বোধগম্য হয়ে ওঠে...'

'সলোভিয়াঙকাতেও এক সময় জানলার বাইরে তুষার ঝড়ের গর্জন শুনেছি, বাড়ির গা ঘেঁসে বেড়ে ওঠা পাইন গাছটায় শনশনানি শুরু হত, চিমনির নলে বাজত কার যেন করুণ কান্না। কিন্তু সলোভিয়াঙকাতে আমি ছিলাম একা, আর এখানে কাছেই বসে থাকতেন আনাতলি পেত্রভিচ, হয় কোনো একটা বইয়ের মধ্যে নিমগ্ন, নয় ছাত্রদের খাতা সংশোধন করতেন, জোয়া শুরা শান্তভাবে খেলা করত, ফিসফিসিয়ে কথা কইত, সবাই একসঙ্গে মিলে কী ভালো, কী উষ্ণই না লাগত আমাদের।'

ছেলেমেয়েদের জন্যে দেবার মতো সময় তাঁদের অল্পই জুটত, কিন্তু সেই অল্প সময়টুকুর মধ্যেই তাঁরা তাদের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারতেন, তাদের প্রয়োজন কী সেটা বুঝতেন ও মেটাতেন।

'কাজকর্ম সেরে নয়ত ছেলেমেয়ে ঘুমুলে করব ভেবে কাজ তুলে রেখে যখন আমি আগুনের কাছ ঘেঁসে এসে বসতাম তখনই শুরু হত আমাদের আসল সন্ধ্যা।'

স্বামীর সময় হত আরো কম, কিন্তু ছেলেমেয়ে সব সময়ই তাঁর অন্তরঙ্গতা টের পেত, তাঁর মনোযোগকে খুবই মূল্য দিত তারা, তিনি যেটুকু বলতেন, সেটা গভীরভাবে গাঁথা হয়ে যেত তাদের শিশু হৃদয়ে।

'মাঝে মাঝে আনাতলি পেত্রভিচ কাজ রেখে এসে যোগ দিতেন কথাবার্তায়, অসীম আগ্রহ নিয়ে ছেলেমেয়েরা শুনত তাঁর কথা। এটা প্রায়ই হত অপ্রত্যাশিত। মাঝে মাঝে মনে হত যেন ছেলেমেয়েরা আমাদের বড়োদের একেবারে ভুলেই গেছে, এক কোণে বসে আপন মনে আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে, হঠাৎ কানে যেতে বই রেখে আনাতলি পেত্রভিচ সরে আসতেন চুল্লির কাছে, নিচু টুলটায় বসে এক হাঁটুর ওপর জোয়াকে আর অন্য হাঁটুর ওপর শুরাকে বসিয়ে ধীরেসুস্থে বলতেন, "তোদের কথায় আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল শোন ..." '

বাপকে তারা অকালেই হারায়, কিন্তু তাঁকে তারা চিরকাল মনে রেখেছে ন্যায়নিষ্ঠ সৎ ও দেশভক্ত এক মানুষ হিসাবে।

সাংসারিক গরমিল শৈশবকে যেমন বিষাক্ত করে তোলে, শিশুদের চরিত্র নষ্ট করে, তেমন আর কিছুতে নয়। বাপ-মায়ের মধ্যে সামান্য মনান্তরটুকুও ছোটোরা চট করে টের পায়। সাংসারিক গরমিল থেকে ছেলেমেয়েরা প্রায়ই সারা জীবনের মতো দেহে মনে বিকৃত হয়ে পড়ে। কিণ্ডারগার্টেনে ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণ করে পরিষ্কার দেখা গেছে যে ছেলেমেয়েদের স্নায়বিক তিক্ততার অধিকাংশ ঘটনাই হল পারিবারিক সংঘাতের ফল।

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণ থেকে দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

জেনিয়া সকালবেলায় কিণ্ডারগার্টেনে এল ভয়ানক বিচলিত, বিধ্বস্ত ভাব নিয়ে, আপন মনে কী ভাবছে, চোখে জল চিকচিক করছে।

তার মনোভারের কারণ বার করতে পারলেন না শিক্ষিকা। ছেলেটি বলে দিলে, 'সেটা খুব গোপন ব্যাপার — কাউকে বলা চলে না।' তার ওপর নজর রেখে কিছুকাল তাকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হল। কিন্তু মেজাজে তার উন্নতি দেখা গেল না। শেষ পর্যন্ত একদিন সে ডুকরে কেঁদে তার গোপন দুঃখের কথা জানাল, 'আমাদের বাড়িতে ভারি একটা খারাপ ব্যাপার হয়েছে, বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চাইছে, মায়েতে আমাতে একলা একলা রোজ কাঁদব।'

জেনিয়ার মা-বাপের বিবাহ বিচ্ছেদ হল। অন্য বাপেরা ছেলেমেয়েদের কী রকম আদর করে দেখে হিংসে হত জেনিয়ার। তার ঘাতপ্রবণ স্নায়ু আর সইতে পারল না, তিক্ত ও বিমর্ষ হয়ে উঠল সে। অতি শৈশবেই ছেলেটির মন ভরে উঠল সেই লোকটির প্রতি ঘৃণায় ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে যে

লঘুচিত্তে সংসার এবং সেই সঙ্গে তার হাসিখুশি শৈশবকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে।

জেনিয়াকে একদিন দেখতে এল বাপ। ছেলে কিন্তু একেবারে নিরুত্তাপ। ছেলেকে আদর করলে বাপ, তার জন্যে উপহারও দিলে। জেনিয়া সে উপহার ফিরিয়ে দিয়ে বহুক্ষণ গোঁ ধরে চুপ করে থাকার পর বললে, 'তোমার লজেন্স আর খেলনায় আমার দরকার নেই। আর কখনো এসো না আমার কাছে।'

সেদিন ভারি চঞ্চলভাবে কাটল জেনিয়ার। মায়ের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলে সে, রাত্রে ভালো ঘুমুলে না, ঘুম ভেঙে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে বাপের জন্যে কাঁদলে। সকালে এল বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক; কারো সঙ্গে কথা কইলে না।

পরিবার যাতে না ভেঙে যায় সে জন্য অনেক সময় মা-বাপ বিবাহ বিচ্ছেদ ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু পারিবারিক সংঘাত চলতেই থাকে। সে ক্ষেত্রে পারিবারিক কলহের শিকার হয় সংসারের শিশুটি।

একটি কিণ্ডারগার্টেনে পাঁচ বছরের একটি মেয়েকে দেখে আমাদের আশ মিটত না। সুন্দর দুটি বেণী, বড়ো বড়ো নীল চোখে অকপট খুশিতে তাকাত পৃথিবীর দিকে, চোখে তার এমন ঝলক যা শুধু সুখী শিশুদের পক্ষেই সম্ভব।

শিক্ষিকা কোনো কিছু একটা গল্প করে শোনালে শান্ত, সবকিছু জানতে উৎসুক এই মেয়েটির চোখ আর সরতে চাইত না। বেড়াবার সময় কেবলি শোনা যেত তার উৎসুক প্রশ্ন 'আর এটা কী? কেমন করে? কেন?' শিশুদের উৎসবের সময় এই মাশেংকা মেয়েটিকে দেখলে বোঝা যেত কী অসংকোচে খুশিতে মাততে পারে সুখী ছেলেমেয়েরা।

মেয়েটি প্রায়ই সানন্দে তার বাবার গল্প করত। প্রতিদিন সে ঘোষণা করত, 'কাল আমি বাবার সঙ্গে পার্কে গিয়েছিলাম। বাবা আমায় খেলনা বানিয়ে দিয়েছে। বাবা আমায় ছবিওয়ালা নতুন বই কিনে দিয়েছে।'

একদিন মেয়েটি ফিরল চুপচাপ, বিষণ্ণ। খেলাধুলা করলে না, এক কোণে চুপটি করে রইল, সেদিন না, পরেও কোন কথা কইলে না বাপের সম্বন্ধে। কী ব্যাপার? মা শিক্ষিকাকে জানালেন ঘটনাটা, 'বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই ছিলাম আমরা, কিন্তু ক্রমেই স্বামী রাত করে ফিরতে লাগল, এবং প্রায়ই নেশা করে। মাশেংকার কাছ থেকে আমার দুঃখটা আমি সযত্নে চেপে রাখার চেষ্টা করতাম।

রাতে ঘুমের আগে বাবাকে শুভ রাত্রি জানানো তার অভ্যাস, মাশা তাই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করত বাবার জন্যে। নানা কথা বলে আমি তাকে শান্ত করতাম, "বাবার কাজ পড়েছে মাশেঙ্কা, সময় নেই, খুব কাজ।" যেদিন মেয়েটার হাবভাবের বদল চোখে পড়েছিল আপনাদের তার আগের দিন রাতে বাপ এমন মাতাল হয়ে ফেরে যে কোনো সংযম ছিল না। নেশায় চুর হয়ে খুব উত্তেজিত জোর গলায় কী যেন বিড়বিড় করলে। আমি ভয় পেয়ে কেবল বলেছি, "চুপ করো, আস্তে, মেয়েটার কথা ভেবো।" হঠাৎ দেখি চিৎকার করে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এল মাশেঙ্কা। সারা রাত মেয়েটা কাঁদে, কেবলি বলে, "ও আমার বাবা নয়, পরের বাবা, শিগগির বার করে দাও ওকে।"'

বছর দুই কাটল। যে কিণ্ডারগার্টেনে মাশেঙ্কা ছিল ফের সেখানে আসি আমরা। তখন তার প্রায় সাত বছর বয়স। ওর নীল চোখ আর হালকা রঙের বেণী দেখেই চিনলাম। কিন্তু সে চোখের দৃষ্টি আর তার হাবভাব একেবারেই অন্য রকম।

পড়াশুনার সময় মনে হল সে যেন শিক্ষিকার কথা শুনছে না, চোখ তার এটা থেকে ওটায় কেবলি সরে যাচ্ছে, নয়ত বা এমন নিশ্চলভাবে কোনো দিকে চেয়ে থাকছে যে বোঝা যায় পড়ার সঙ্গে একেবারেই সংশ্রবহীন কোনো একটা কথা সে ভাবছে। সোজাসুজি তাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে চট করে সাড়া দেয় না, যেন তা কানেই ঢোকেনি। খেলাধুলাতেও দেখা গেল সমান অন্যমনস্ক, এক কোণে চুপ করে থাকে, আগের মতো তন্ময় উল্লাসে খেলতে দেখা গেল না তাকে।

সবচেয়ে অবাক লাগল শিশু উৎসবে তার আচরণ দেখে। একেবারেই নিস্পৃহ হয়ে বসে রইল মেয়েটি, শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আর থেকে থেকে অস্থিরভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগল ফ্রকের কোনাটা।

মেয়েটির এই স্নায়বিক অস্থিরতা ও নিস্পৃহতায় শঙ্কা বোধ না করে পারা গেল না, বিশেষ করে এই জন্য যে কয়েক মাসের মধ্যেই তার স্কুলে ভর্তি হওয়ার কথা। কোথায় গেল তার আগের সেই ক্ষিপ্রতা, মনোযোগ, হাসিখুশি, ফুর্তি।

কিণ্ডারগার্টেনে সেই আগেরই পরিচালিকা, মেয়েটির পরিবারেও কোনো বদল হয়নি। মা-বাপ দুজনেই ভালোবাসত মেয়েটিকে, তার জন্যেই

ঠিক করেছে বিবাহ বিচ্ছেদ করবে না, কিন্তু শিশুর পক্ষে যা অতি দরকার, আগের সেই শান্ত, মিলমিশ জীবন তারা আর গড়ে তুলতে পারেনি। তার বদলে দেখা দিয়েছে অবিশ্বাস, বিরক্তি, এবং প্রায়ই মতান্তর। প্রেম সুখ সৌহার্দ্যের যে অভ্যস্ত পরিবেশ এতদিন বজায় ছিল তা ভেঙে যাওয়ায় শিশুর মনে কোনো প্রতিক্রিয়া না ঘটিয়ে পারেনি।

সংসারের এই গভীর ক্ষতটা সবার আগে আঘাত করেছে শিশুকেই। সংবেদনশীল মেয়েটিকে যা বুঝতে হয়েছে, ভুগতে হয়েছে, অনুভব করতে হয়েছে তা তার শক্তির বাইরে। বাপ-মা উভয়ের প্রতি তার ছিল এক সুকোমল স্নেহ। তাদের মধ্যে কলহের সময় মেয়েটিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিতে হয়েছে বিচারকের ভূমিকা, এক জনের হয়ে স্বভাবতই অন্যজনের নিন্দে করতে হয়েছে।

অনেক সময় শিশুটি নিজেই হয়ে উঠেছে কলহের উপলক্ষ। বাপ-মায়ে উভয়ে চেয়েছে মেয়েটির সহানুভূতি যেন তার দিকেই থাকে। বাপ-মায়ের প্রতি মনোভাবে মেয়েটি সুস্থির থাকতে পারেনি, এবং তাদের প্রতিষ্ঠাও তার চোখে টলে উঠেছে। অনেক কিছুই তাকে শুনতে হয়েছে যা তার শোনার কথা নয় এবং বয়স্কদের কলহের ক্ষিপ্ত উত্তেজিত সুরে তার স্নায়ুতন্ত্র ঘন ঘন এত অতি-উত্তেজিত হয়েছে যে তাদের কথায় তার আর কোনো প্রতিক্রিয়া হত না, তার প্রতি আদেশ নির্দেশ সে আর কানে তুলত না। এই থেকেই দেখা দেয় অন্যমনস্কতা, অবাধ্যতা, তা থেকে আবার দেখা দেয় মা-বাপ ও শিক্ষিকাদের অসন্তোষ ও বিরক্তি।

মা-বাপের মধ্যে কলহ এবং বিবাহ ও বাপ-মায়ের কর্তব্যের প্রতি লঘুচিত্ত মনোভাবের ফলে এই ধরনের গুরুতর পীড়ন সইতে হয় শিশুদের। এই সব ক্ষেত্রে বলা কঠিন শিশুর পক্ষে কোনটা বেশি অনিষ্টকর মা-বাপের মধ্যে বিচ্ছেদ নাকি নিত্য কলহ যা দিনের পর দিন শিশুর স্নায়ু উত্ত্যক্ত করে চরিত্র-বিকার ঘটায়।

একটা কথা শুধু বলা যায়। মা-বাপের কখনো ভোলা উচিত নয় যে তাদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি মেলা আছে, তাদের লঘুচিত্ত আচরণের পুনরাবৃত্তি হবে তাদের ছেলেমেয়েদের জীবনে, যারা নিজেরাই একদিন হয়ে উঠবে পিতামাতা।

তাছাড়া, কবে বেড়ে উঠবে তার জন্য শিশুরা অপেক্ষা করে না, যা কিছু তারা দেখে বা শোনে তা অবিলম্বেই অনুকরণ করতে শুরু করে। পর্যবেক্ষণশীল শিক্ষক সর্বদাই ধরতে পারে শিশুর সংসারে কী ঘটছে এবং পরিবেশের কোন ছাপটা তার ওপর বেশি করে পড়ছে।

অনধিক সাত বছরের শিশুদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার অনুকরণপ্রিয়তা ও সংবেদনশীলতা। মা-বাপ এবং আশেপাশের লোকজনকে অনুকরণ করেই সে তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তাই **মা-বাপ এবং আশেপাশের লোকজনের দৃষ্টান্ত অনধিক সাত বছর বয়সের শিশুদের গড়ে তোলার দিক থেকে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ।**

সাত বছরের বেশি বয়সের ছেলেমেয়েরা আশেপাশের লোকজনের আচার আচরণ বিচার করে দেখার মতো ক্ষমতা ধরে। এর ফলে তারা অনুকরণ যোগ্য দৃষ্টান্ত বাছাই করতে পারে সচেতনভাবে। স্কুল ছাত্রদের তাই সাধারণত থাকে নিজস্ব এক একটা আদর্শ, নিজের প্রিয় নায়ক, যার অনুকরণ করতে চায় তারা।

অনধিক সাত বছরের শিশুদের তখনো কোনো নিরিখ গড়ে ওঠে না যা দিয়ে সে ভালোমন্দ বিচার করবে: যেটা নজরে পড়ছে তার ওপর নির্ভর করেই সে ভালোমন্দ উভয়ই সমানে অনুকরণ করতে চায়। ছেলেমেয়েদের খেলা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে অধিকাংশ খেলাতেই তারা বড়োদের আচার আচরণ অনুকরণ করে। শিশুরা সবচেয়ে ভালোবাসে 'কর্তা গিন্নি' খেলতে। তবে শিশু অনুসারে এ খেলার তাৎপর্যে বিভিন্নতা দেখা দেয়।

চার বছুরে নিনার খেলায় বাবা কারখানায় যায় 'ইঞ্জিন বানাতে' আর ছেলেমেয়েদের শুইয়ে মা মিটিঙে যায় 'বক্তৃতা দিতে'। মেয়েটির মা হল নগর সোভিয়েতের প্রতিনিধি, বাপ ট্র্যাক্টর কারখানার শ্রমিক।

নেলী সবচেয়ে ভালোবাসে 'সইয়েদের বাড়ি বাড়ি বেড়াতে'। মা তার কাজ করে না, সংসারের কাজকর্ম সারে বাড়ির ঝি, তাই পাড়াপ্রতিবেশির সঙ্গে বাজে বকার মতো সময় তার অনেক।

ভানিয়ার বাপ নাবিক, ছেলেটি যেখানেই থাক, একটা স্টিয়ারিং আর চিমনি সমেত জাহাজ বানিয়ে নিতে তার দেরি হয় না। এ ব্যাপারে তার উদ্ভাবন শক্তি একেবারে আশ্চর্য।

বাপ-মায়ের তথা ভাই বোনের পারিবারিক জীবনই হল শিশুদের খেলাধুলা এবং সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে তাদের আলাপের বিষয়বস্তু, তাদের আচার ব্যবহার একটা দিক নেয় এ থেকে, চরিত্র গঠনের ওপর তার বিপুল প্রভাব পড়ে। শিশুরা চায় যে তাদের বাপ-মা যেন হয় সবচেয়ে ভালো, সুন্দর এবং সৎ। অন্ধের মতো এটা তারা বিশ্বাস করে এবং মা-বাপে যা করে সেটা তারা সাধারণত খুবই জরুরী ও অত্যাবশ্যক বলে ভাবে। এদিক থেকে মা-বাপের একটা বিশেষ দায়িত্ব এসে পড়ে, নিজেদের আচরণ বিশ্লেষণ করে তাদের দেখা উচিত সর্বক্ষেত্রেই তা অনুকরণের যোগ্য কিনা।

সংসার যাত্রায় খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপার হয় যা মা-বাপে প্রায়ই নজর করে না, কিন্তু ছেলেমেয়েদের ওপর তার প্রভাব পড়ে প্রচুর।

যেমন ধরা যাক বড়োদের কথাবার্তার ধরন। তাদের কাছ থেকেই তো শিশু প্রথম কথা শেখে, মাতৃভাষা আয়ত্ত করে।

কী বিষয়ে, কী ভাবে কথা বলে শিশুরা? পরিবারের মধ্যে যা দেখে যা

হুঁশিয়ার, জাহাজ ছাড়ল!

শোনে তাই নিয়েই বলে এবং কথার ধরনও সেই রকম হয়। নিজেদের মধ্যে আলাপ করার সময় শিশুটির উপস্থিতি মা-বাপে প্রায়ই নজর করে না, মুখ খারাপ করে। ছেলেটি খেলা করে চলেছে, বাপ-মায়ের কথায় যেন তার মন নেই। অথচ কিছু দিন পরে বাচ্চাদের খেলায় নজর দিতেই মা-বাপ দেখে 'অশোভন' কথার পুনরাবৃত্তি করছে তারা।

একটা কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষিকা তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, 'আজ আমি ভারি মুশকিলে পড়েছিলাম। শুরিক নামে নতুন একটি ছেলে এসেছে, বেশ সভ্যভব্য, হাসিখুশি, হঠাৎ শুনি মুখে তার কদর্য অশোভন বুলি, কিন্তু তা উচ্চারণ করছে একেবারে নির্দোষ সদাশিব ভাব করে। ধমক দিয়ে বললাম, "শুরিক ও সব কথা বলে না, ও সব কথা বলে কুলোকেরা। ভারি খারাপ এটা।"

'শুরিক খুব নিশ্চিন্তে জানাল, "মোটেই খারাপ নয়। বাবা বলে যে — আর বাবা আমার সবচেয়ে ভালো লোক। কারখানায় তাকে সবাই ভালোবাসে, বড়ো হয়ে আমিও বাবার মতো হব।"

'ন্যায়তই বাপকে নিয়ে গর্ব করবে ছেলে, তাঁর কোনো ত্রুটি থাকতে পারে এটা মেনে নেওয়া তার পক্ষে মুশকিল। শুরিকের বাবার সঙ্গে কথা বললাম আমি। লজ্জিত ও চিন্তিত ভাবে তিনি বললেন, "দ্যাখো ব্যাপার, ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে ছেলেটা আমার বদ অভ্যাসটি রপ্ত করবে।"'

অন্য রকম ব্যাপারও ঘটে। শিশুর বিশ্বাস যে তার বাপ-মায়ে সর্বদাই ন্যায় কাজ করে। তারপর হঠাৎ দেখে তাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, মা অথবা বাপ নিজেই তা লঙ্ঘন করছেন। ওলেগের বাপ ওলেগকে শিখিয়েছেন সর্বদা সত্য কথা বলবে, ছেলেকে কোনো কথা দিলে তিনি নিজে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। ওলেগ তার সঙ্গীসাথীদের প্রায়ই বলে, 'মা বাবা আমি, আমরা সব সময় সত্যি কথা বলি।' কিন্তু একদিন ঘটল এই।

বাপ বলছিলেন, 'আমি একটা জরুরী রিপোর্ট তৈরি করছিলাম, কিন্তু সারা দিন টেলিফোন বাজায় কাজ এগুচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে বসলাম, টেলিফোনের ঘণ্টি বাজতেই বউকে বললাম, 'বলো বাড়িতে নেই।' হঠাৎ শুনি ছেলের ফোঁপানি। ওলেগ কোণে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছে। 'কী হল তোর?' মা-বাপ আমরা দু জনেই শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। "আমি... আমি ভেবেছিলাম, তুমি কখনো মিথ্যা কথা বলো না।"'

বাপের কথা যে স্থির সত্য এই বিশ্বাসের ওপর প্রথম আঘাতটা খুবই পীড়িত করেছিল ছেলেটিকে। এই ধরনের তুচ্ছ ব্যাপার যদি প্রায়ই ঘটতে থাকে তবে মা-বাপের প্রতিষ্ঠা অনিবার্যই ভেঙে পড়বে।

নেলীর মা প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার করে, কিন্তু তারা চলে যেতেই বলে, 'উঃ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, বকতেও পারে যাহোক।'

মায়ের কথায় মেয়েটির কোনো মন নেই বলেই প্রথমটা মনে হয়েছিল। পরে কিন্তু একদিন সে বললে, 'আচ্ছা মা, পড়শী এলে তুমি বলো, "ভারি আনন্দ হল, আসুন, বসুন।" আর পরে বলো, "কী বকে।"'

আর একটু বড়ো হতেই মেয়েটি লক্ষ্য করল যে মা পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলার সময় যা নেই তা নিয়ে বড়াই করতে ভালোবাসে, অথবা মেয়েকে কিছু একটা কিনে দেব বলে কিন্তু ভুলে যায়।

মেয়েটির মুখেও এই জবাব শোনা যেতে লাগল, 'মা, তুমি বলো সর্বদা সত্যি কথা বলবে আর তুমি নিজে যে মানিয়া কাকীকে মিথ্যে বললে!' কিংবা 'কিনে দেবে না কেবল ধোঁকা দিচ্ছ মা।'

এ থেকে বেশ বোঝা যায় **বাপ-মা এবং সংসারের অন্য সকলের আচরণের উত্তম নিদর্শন ছেলেটি যাতে সর্বদাই দেখে তা কত জরুরী।**

শিশুর ওপর শুধু পরিবার নয়, সঙ্গীসাথীদের প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ।

এই বয়সটা ভারি সংবেদনশীল, সহজেই অন্যের প্রভাব পড়ে। তাই ছেলেমেয়েরা কাদের সঙ্গে খেলছে সেটা ভালো করে জানা মা-বাপের কর্তব্য। খুব আকস্মিক একটা প্রভাব থেকেও মাঝে মাঝে অত্যন্ত কুফল দেখা দেয়।

কিন্ডারগার্টেনে একদিন বিব্রতভাবে এলেন এক পিতা, 'ভারি বিপদ হয়েছে আমাদের। বহুদিন থেকেই লক্ষ্য করছিলাম এটা ওটা ইনস্ট্রুমেণ্ট হারাচ্ছে, বিশেষ নজর দিইনি, ভাবতাম পড়ে আছে কোথাও, কে আর নেবে। কাল সকালে কাজে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, হঠাৎ দেখি ভিতিয়া ইতি-উতি চাইছে, পকেটে কী যেন লুকোবার চেষ্টা করছে। কিছুই টের পাইনি এই ভাব করে চারিদিকটা নজর করে দেখলাম। এক কোণে ছিল আমার স্ক্রুড্রাইভার, সেটা নেই। ভিতিয়ার পকেটে উঁকি দিয়ে দেখলাম স্ক্রুড্রাইভারটা সেখানে। ভাবলাম, দেখি কী ঘটে।

'মা ওকে তার দিদিমার বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। ফিরল সন্ধ্যায়। কাজ থেকে ফিরে দেখি স্ক্রুড্রাইভার নেই।

' "স্ক্রুড্রাইভারটা কোথায়?"

' "জানি না তো, দেখিইনি।"

' "দেখিসনি মানে, তুই তো সেটা নিয়ে গিয়েছিলি দিদিমার বাড়ি।"

' "না, নিইনি।"

' "না, নিইনি," এছাড়া আর কোনো কথা নেই।'

শিক্ষিকা পরামর্শ দিলেন দিদিমার বাড়িতে থাকার সময় ছেলেটা কার সঙ্গে খেলে তা দেখতে। বোঝা গেল, দিদিমার বাড়ির সবাই কাজে চলে যায় সকালে। ছেলেটার একা একা লাগে। পাশের বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়। তারা সকলেই বয়সে ওর চেয়ে বড়ো। দিদিমা একটু চোখ বুঁজতেই ছেলেটি পালায়। সঙ্গীরা ওকে হুকুম করে পেরেকটা, স্ক্রুড্রাইভারটা, করাতটা কি ফোঁড়ার শলাকাটা নিয়ে আসতে। প্রথম প্রথম ছেলেটা আপত্তি করেছিল, 'না, বাবা দেবে না।' 'তুই বলবি না। পরে জায়গা মতো রেখে দিবি কেউ টের পাবে না।'

ঘরে জিনিসপত্র রাখার জায়গা খুব নির্দিষ্ট ছিল না। জিনিস উধাও হচ্ছে সেটা মা-বাপে সত্যিই চট করে ধরতে পারেনি।

বন্ধুরা বুঝিয়েছিল, 'দেখিস, বলিস না যেন, বন্ধুদের প্রতি বেইমানি করিস না।'

তাই বাপ-মার কাছ থেকে গোপন কথাটা লুকিয়ে রাখল ভিতিয়া, সে কথা ফাঁস করা মানেই যে বন্ধুদের প্রতি বেইমানি করা।

এই বয়সের শিশুদের মা-বাপেদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার মতো কোনো গোপন ব্যাপার থাকা উচিত নয়, অবশ্য মা-বাপেদের জন্যে একটা সানন্দ বিস্ময় ঘটাবার মতো 'ক্ষণিক' গোপনীয়তা ছাড়া।

তার জন্য দরকার শিশুদের মধ্যে সর্বাগ্রে সততা জাগিয়ে তোলা। আ. মাকারেঙ্কো বলেছেন, 'সততা হল অকপট আন্তরিক আচরণ। অসততা হল গোপন লুকোচুরি আচরণ। শিশুটি যদি আপেল খেতে চায় এবং খোলাখুলিই তা বলে, তবে এটা হল সৎ আচরণ। আর যদি সে তার

কামনাটা গোপন রেখে লোকের চোখের আড়ালে আপেলটা হস্তগত করতে চায় তবে একাজ হল অসৎ।'

উপরের ক্ষেত্রে বিপদটা এই নয় যে ছেলেটা বন্ধুদের অনুরোধে এমন কতকগুলো জিনিস এনে দিয়েছে যা তাদের মাথা খাটানো কোনো একটা জিনিস বানাবার জন্য দরকার। বিপদটা এই যে এটা হল 'গোপন লুকোচুরি আচরণ'।

ভিতিয়ার বাবা ছেলেগুলির সঙ্গে আলাপ করে বুঝিয়ে বলে যে বন্ধুত্ব কথাটা তারা ভুল করে বুঝেছে, ফলে ছেলেটি তার মা-বাপকে প্রতারণা করার শিক্ষা লাভ করতে যাচ্ছিল। স্ক্রুড্রাইভারটা তাদের দরকার কেন একথা জানার পর সে এই ছেলেগুলির বাপ-মায়ের সঙ্গে কথা বলে, ছেলেপিলেদের জন্য একসঙ্গে তারা উপযোগী একটা ইনস্ট্রুমেণ্ট বাক্‌স কিনে দেয়।

ছেলেটিকে দিদিমার কাছে রেখে দিয়ে মা-বাপে যদি প্রত্যেক দিন খোঁজ নেবার চেষ্টা করত কী ভাবে, কাদের সঙ্গে তার সময় কাটছে, সময় মতো যদি তার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করে নিত, তাদের যৌথ আগ্রহ কীসে তা জেনে সঠিকভাবে তাদের পরস্পর সম্পর্ক গড়ে তুলত, তাহলে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে 'চুরি'র ঘটনাটা ঘটত না।

বাপ-মায়ের অবশ্যই জানতে হবে কী করে সময় কাটাচ্ছে ছেলেটি, শিক্ষাদানের লক্ষ্য মনে রেখে অবিরত তার আগ্রহকে সুপরিচালিত করতে হবে।

কেউ কেউ ভাবেন এ দাবি অবাস্তব। 'সারা দিন তো আর ছেলের পেছনে ঘোরা যায় না — নিজের কাজকম্ম তো আছে।' এ সন্দেহের জবাব দেব এমন এক চমৎকার সোভিয়েত মায়ের কথায় যাঁর সন্তানের মূর্তি চিরকাল বেঁচে থাকবে।

'জোয়া আর শুরার কাহিনীতে' ল. কসমোদেমিয়ানস্কায়া লিখেছেন, '"ছেলে মানুষ করার সময় আমার নেই, সারা দিন কাজ।" এ কথা প্রায়ই শোনা যায়। আমি ভাবি ছেলে মানুষ করার জন্য কি আর একটা বাঁধা ধরা সময় দরকার? আনাতোলি পেত্রভিচ আমায় এই কথাটা শিখিয়েছেন: প্রতিটি ছোটোখাটো ব্যাপারে, তোমার প্রত্যেকটি আচরণ, দৃষ্টি, কথা দিয়েই ছেলে মানুষ হয়। এ সবই গড়ে তোলে তোমার ছেলেকে; কী ভাবে কাজ করছ,

বিশ্রাম নিচ্ছ, বন্ধু অ-বন্ধুর সঙ্গে কী ভাবে কথা কইছ, সুস্থ অবস্থায় অথবা রোগে, শোকেদুঃখে এবং আনন্দে কী ভাবে চলছ — এসবই লক্ষ্য করে তোমার ছেলে এ সবেতেই নকল করতে চায় তোমায়। আর যদি তার কথা, তোমার প্রতিটি আচরণ থেকে উপদেশ আর দৃষ্টান্তের সন্ধানী তার তীক্ষ্ন চোখ দুটির কথা ভুলে বসো, খাইয়ে দাইয়ে জামা জুতো পরিয়ে রাখলেও ছেলেটি যদি তোমার পাশে থেকেও একলা একলা বাড়তে থাকে, তাহলে তাকে সঠিকভাবে মানুষ করে তুলতে কিছুই সাহায্য করবে না: না দামী খেলনা, না তাকে নিয়ে হাসিখুশি বেড়ানো, না কঠোর বিবেচক হিতোপদেশ। নিজের ছেলেটির সঙ্গে তোমায় থাকতে হবে অনবরত, সব ব্যাপারেই যেন সে তোমার অন্তরঙ্গতা অনুভব করে, কখনো যেন এতে তার সন্দেহ না হয়।'

মা-বাপ বা নিকট আত্মীয়ের সুদৃষ্টান্তের ফল তাদের অনুপস্থিতিতেও ব্যাহত হয় না যদি অবশ্য সে দৃষ্টান্ত যথেষ্ট প্রত্যয় যোগ্য হয় এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মা-বাপের প্রয়োজনীয় অন্তরঙ্গতা থাকে। গোর্কি অঞ্চলের কামেঙ্কা গ্রামের যৌথকৃষাণী শ্রীমতী রেচিনা এ কথাটা খুব ভালো করে বলেছিলেন তাদের জনক সম্মেলনের বক্তৃতায়: 'আমাদের ছেলেমেয়েদের কেউ যদি অবাধ্যতা করতে চায় অথবা বাড়িতে নেই এমন একটা জিনিসের জন্যে ঝোঁক ধরে তাহলে আমি শুধু বলি, বাবা কি তোকে এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন? এই করেই তুই বাবাকে সম্মান দেখাচ্ছিস? সঙ্গে সঙ্গেই মিটে যায়। বাবা এদের মাতৃভূমি রক্ষায় প্রাণ দিয়েছেন। ছোটো থেকে বড়ো সবাই আমরা শ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণ করি।'

অনধিক সাত বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে, বিশেষ করে যাদের বয়স ওপরের দিকে তাদের পক্ষে দৃষ্টান্তের তাৎপর্য বেশি। মা-বাপের দৃষ্টান্তের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মহাপুরুষদের দৃষ্টান্তও যোগ হয়। নৈতিক গুণ গড়ে তোলার দিক থেকে তার প্রভাব অনেক।

অনেকেই প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু ভালো বাপ-মায়ের খারাপ ছেলেমেয়ে হয় কেন? ছেলেমেয়েদের কাছে তাঁরা তো আর খারাপ দৃষ্টান্ত দিয়ে যান না।

দৃষ্টান্তের জোর অনেক, কিন্তু ব্যাপারটা এই যে সুদৃষ্টান্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রযোজ্য নয়। আ. মাকারেঙ্কো লিখেছেন, 'ভালো লোকের নিষ্ক্রিয় সাহচর্যের

মতো বিপজ্জনক আর কিছুই নয়, স্বার্থপরতা বিকাশের সেই হল উত্তম পরিবেশ। এরূপ ক্ষেত্রেই ভালো লোকেরা প্রায়ই সবিস্ময়ে হাত উলটিয়ে শুধোন, "ছেলেটা কার স্বভাব যে পেয়েছে কে জানে?"'

সুদৃষ্টান্তের কুপ্রয়োগ হতে পারে, যদি মা-বাপে সক্রিয়ভাবে ছেলেমেয়েদের না বোঝান, **যদি সদগুণ বিকাশের জন্য নিয়মিত অনুশীলনের পরিস্থিতি গড়ে তোলা** না হয়। কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ তার ভালো মতো ধারণা থাকলেও এই অনুশীলন ব্যতীত কেবল ভালো জিনিসটাই আচরণ করার অভ্যাস গড়ে তোলা যায় না, আর অভ্যাস সে তো দ্বিতীয় প্রকৃতি।

শিশুদের স্বভাবই হল সক্রিয়তা, কিছু একটা করতে সে সদাই সচেষ্ট।

মা-বাপের কর্তব্য হল এই সক্রিয়তাকে বাড়িয়ে তোলা, সমর্থন করা এবং শিক্ষাদানের গৃহীত লক্ষ্যের দিকে তাকে চালিত করা।

আমরা চাই, আমাদের পক্ষে এটা অত্যাবশ্যক, যাতে আমাদের উত্তর পুরুষেরা বেড়ে ওঠে শক্ত সমর্থ ও সুখী হয়ে।

ন. ক. ক্রুপস্কায়া

সুস্থ সানন্দ শিশু

অনধিক সাত বছর বয়সের শিশুদের যা বৈশিষ্ট্য তাতে তাদের দৈহিক বিকাশের দিকে খুব মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যাঁরা শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের বিপরীতে কেবল দৈহিক বিকাশের কর্তব্যটাকেই সামনে টেনে আনেন, ছেলেটি যেন 'সুস্থ ও পরিতৃপ্ত' থাকে শুধু এই টুকুই দেখেন তাঁরা মোটেই সঠিক নন।

বাইরে থেকে দৈহিক সুস্থ, বিশেষ রোগে ভোগে না এরূপ শিশুর মধ্যেও প্রায়ই এমন দৈহিক ত্রুটি লুকিয়ে থাকে যা শীঘ্র অথবা বিলম্বে পরে প্রকাশ পাবে, অথচ শৈশবেই যা সহজ সারিয়ে তোলা যায়।

দৈহিক লালনের ক্ষেত্রে কেবল নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধি পালনটার ওপরেই নজর রাখলে চলে না, **প্রচুর শিক্ষাদানমূলক কর্তব্যও** প্রয়োজন। কেবল সেই ক্ষেত্রেই বেড়ে ওঠে শক্ত সমর্থ, হাসিখুশি শিশু, দৈহিকভাবে যারা সর্বাঙ্গীন বিকশিত, চলন বলন যাদের নিখুঁত ও সুন্দর। যে শিশুটির লক্ষ্য নিখুঁত, অনায়াসে দ্রুত ছুটতে পারে, ভালো লাফায়, বল লোফালুফি করতে পারে চমৎকার, ঠান্ডা ভয় পায় না, ছোটো থেকেই পোড় খেয়ে ওঠে, তার দৈহিক বিকাশ হবে সুস্থতর; খেলাধুলা, শিশু-ব্যায়াম, মেহনত ইত্যাদি মারফত যে আদুরে ছেলে সর্বাঙ্গীন দেহচর্চায় পোড় খেয়ে ওঠেনি তার চেয়ে তার রোগপ্রবণতা হবে অনেক কম।

এ দিক থেকে অনেক কিছু করবার আছে মা-বাপের, শিশুর দেহকে দৈনিক পোক্ত করে তুলতে হয়, ছুটোছুটির খেলাধুলায় তাকে উৎসাহিত করতে হয়, প্রাথমিক ব্যায়াম শেখাতে হয় তাকে। শিশুদের দৈহিক লালনের ব্যাপারে সোভিয়েত বিজ্ঞান শিশুদের দৈহিক ব্যায়ামের ওপর অনেক জোর দেয়।

ছুটোছুটির খেলা ও দৈহিক ব্যায়ামের একটা পুরো পদ্ধতি সংরচিত হয়ে উঠেছে এদেশে। সর্বাঙ্গীন দৈহিক বিকাশের জন্য ব্যায়াম একান্তই অপরিহার্য। চার থেকে সাত বছর বয়সের শিশুদের জন্য প্রাতঃকালীন ব্যায়ামের একটা তালিকা দেওয়া হল ১নং পরিশিষ্টে।

শারীরিক ব্যায়ামের মধ্যে **ছোটো থেকেই শিশুর দেহকে পোড় খাইয়ে তোলার** প্রশ্নটাও অবশ্যই পড়ে। যে শিশু চিকিৎসক শিশুটির ব্যক্তিগত দৈহিক বৈশিষ্ট্য জানেন, তিনি মা-বাপকে এ বিষয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তার সুপারিশ করতে পারবেন।

শিশুর সঠিক বিকাশ আর সুস্থতার এক মূল শর্ত হল সঠিক **আহার।** শিশুর বাড় ও প্রাণ-স্ফূর্তির উপাদান আসে যে মৌলিক উৎস থেকে সেটা হল খাদ্য। সব মা-বাপেই তা জানেন ও সর্বতোভাবে পুষ্টিকর খাদ্য দেবার চেষ্টা করেন। মনে হতে পারে এটা খুবই সরল দৈনন্দিন একটা ব্যাপার। কিন্তু কার্যত তা সাধন করতে হলে শিশু পুষ্টি বিজ্ঞানের মূলকথাগুলির জ্ঞান থাকা দরকার। যেমন শিশুখাদ্যে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও কার্বো-হাইড্রেটের সঠিক অনুপাত না মানা হলে তার বিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে (ডায়াথিসিস)।

অনধিক সাত বছর বয়সের শিশুদের দিন ৫০ গ্রাম প্রোটিন, ৪৫-৫০ গ্রাম স্নেহপদার্থ, ২২০ গ্রাম কার্বো-হাইড্রেট দরকার। কিন্তু এই সঙ্গে যদি ভিটামিন না থাকে, তাহলে বাড় কম হবে, স্কার্ভি, রিকেট ও স্নায়ুপীড়া ঘটতে পারে।

এই জন্যই বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য দরকার বিশেষ করে শাকসব্জী ও ফল। তাই দৈনিক খাদ্য তালিকা এমন ভাবে করা উচিত যাতে সঠিক পুষ্টির পক্ষে অপরিহার্য সমস্ত উপাদান থাকে। সোভিয়েত দেশে শিশুদের আহার্যের ছক রচনা করা হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমির পুষ্টি ইনস্টিটিউট থেকে।

ভালো পরিপাকের জন্য খাদ্যের বৈচিত্র্য ও সুরন্ধন খুবই প্রয়োজন। প্রতিদিন একই খাদ্য দিতে থাকলে শিশুর অরুচি দেখা দিতে পারে। খাদ্য ভালো করে প্রস্তুত করা না হলে অথবা শিশুর কোনো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যে অনেক সময় খাদ্য ফল দেয় না। যেমন সঠিক বিপাক ক্রিয়া লঙ্ঘন হলে কোনো কোনো খাদ্য শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর।

এই বয়সের শিশুরা পরিবারের সকলের সঙ্গে একত্রে আহার গ্রহণ করতে পারে, তবে শব্জী ফল ও দুধের কয়েকটি পরিপূরক খাদ্য তাদের জন্যে দরকার।

শিশু কিন্ডারগার্টেনগুলিতে ও পরিবারে শিশুর আহার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, কী খাদ্য দেওয়া হচ্ছে কেবল তাই নয়, কী ভাবে দেওয়া হচ্ছে সেটাও অতি জরুরী। এটা কেবল **সঠিক আহারদানের প্রশ্ন নয়, এ হল লালনের প্রশ্ন।**

অনেক মা-বাপে নালিশ করেন। শিশু খেতে চায় না। বাস্তবিকই সে দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। মহান সোভিয়েত শারীরবিদ ই. পাভলভ দেখিয়েছেন যে সঠিক পুষ্টির এক প্রাথমিক শর্ত হল ক্ষুধাবোধ। বিনা খিদেয় এবং সেই হেতু যথেষ্ট লালা ও পরিপাক রস না মেশায় আহার যথেষ্ট ফলপ্রদ হয় না।

খিদে না পাবার কারণ কী? শিশুর কোনো একটা পীড়া তার কারণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ডাক্তার দেখান দরকার। কিন্তু প্রায়ই তার কারণ আহার ব্যবস্থার বেঠিকতা ও লালনের ত্রুটি।

ই. পাভলভ ও তাঁর ছাত্রদের গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে স্বাভাবিক খিদে ও সঠিক পরিপাক ক্রিয়ার জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হল সময় বেঁধে খাদ্য গ্রহণ, **খাদ্যের ব্যাপারে কঠোরভাবে রুটিন মেনে চলা অল্প বয়সের শিশুদের পক্ষে অতি জরুরী।** মাতৃসদনে জন্মের প্রথম দিন থেকেই শিশুর খাদ্যের জন্য রুটিন বেঁধে দেওয়া হয় এবং তা নিখুঁতভাবে পালনের ওপর নবজাতকের স্বাস্থ্য ও মেজাজ অনেকটা নির্ভর করে। মা যদি শিশুর জন্য তেমনি নিখুঁতভাবে রুটিন পালন করে চলেন তাহলে শিশুর স্বাভাবিক ও সুস্থ ক্ষুধাবোধ নিশ্চিত হয়, কেননা তার দেহযন্ত্র আহারের একটা নির্দিষ্ট

চল বেড়াতে যাই!

ছন্দে অভ্যস্ত হয়ে যায়। সে ছন্দ ভাঙলে শিশুর দেহক্রিয়া বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে, তার ক্ষুধামান্দ্য ঘটে, জেদ আর অস্থিরতা দেখা দেয় তার মধ্যে।

কিন্ডারগার্টেনে ঘড়ি বেঁধে খাবার দেওয়া হয় শিশুদের। পাঁচ বছরের লিউদা দিন কয়েকের জন্য তার আত্মীয়দের বাড়ি গেল অন্য শহরে। কিন্ডারগার্টেনে দুপুরের খাওয়ার সময়। লিউদাও প্রথম দিনেই খাবারের কোনো কথা না উঠতেই, টেবিল তখনো পাতা না হলেও বসে পড়ে বলে, 'ক্ষিদে পেয়েছে, এখন খাওয়া দরকার।' পরের দিন খেলনা কেনার জন্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হল দোকানে। খাবার অভ্যস্ত সময় পেরিয়ে গেল। ফিরে এসে তার খাবার কথা মনে পড়ল না তাই নয়, যে খাদ্যটা তার খুবই প্রিয় সেটাও সে খেলে অনিচ্ছা ভরে, খেয়ালীপণা করে।

অনধিক সাত বছর বয়সের শিশুদের পক্ষে আহারে তিন কি সাড়ে তিন ঘণ্টার ব্যবধান স্বাভাবিক বলে ধরা হয়। প্রাতরাশ, মধ্যাহ্ন আহার, বৈকালিক আহার ও নৈশাহারের মাঝে মাঝে যদি এটা ওটা বিস্কুট, লজেন্স বা দুধ দেওয়া হয়, তাহলে সেটা যত কমই হোক পরের খাবারের সময় তার স্বাভাবিক সুস্থ ক্ষিদে নষ্ট হয়ে যায়। সুস্থ ক্ষুধাবোধের জন্য খাওয়ার সময়টায় একটা প্রীতিকর অনুসঙ্গ গড়া দরকার। সুশ্রী পরিবেশন, চমৎকার প্রিয় প্লেটটি, শিশুটি যা ভালোবাসে তেমন অন্তত একটি খাবার, চারপাশের লোকজনের শান্ত সদয় মেজাজ এ সবের ফলে খাদ্য গ্রহণের সময়টা শিশুর কাছে লোভনীয় ও প্রীতিকর হয়ে ওঠে। মা-বাপে যখন ঠিক খাবার সময়টিতেই শিশুকে ভর্ৎসনা করে, বা তার আচরণে অসন্তোষ দেখায়, অথবা তার অপছন্দ কোনো খাদ্য গ্রহণে কড়া গলায় হুকুম করে, তখন ভয়ানক ভুল হয়। এ সবের ফলে শিশুর মনে একটা অপ্রীতিকর অনুসঙ্গ গড়ে ওঠে, খাবার সময়টা তার কাছে হয়ে দাঁড়ায় বিশ্রী।

খাবার সময় এটা ওটা কথা কয়ে বা গল্প পড়ে ভুলিয়ে সেই অবকাশে তার মুখে যদি খাবার গুঁজে দেওয়া হতে থাকে, অথবা শিশু নিজেই যদি বিনা আগ্রহে ও খিদেয় যান্ত্রিকভাবে তা খেতে থাকে, তাহলেও উপকার হয় না। শিশুর কাছে এই মন ভুলানো ব্যাপারটা অভ্যাস হয়ে যায়, খেতে বসে সে খাবার জন্যে হাত না বাড়িয়ে অভ্যস্ত গল্প শোনার জন্যে অপেক্ষা করে।

ক্রমশ তার স্বাভাবিক সুস্থ ক্ষুধাবোধ লোপ পায়, অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় জিনিসটা।

ই. পাভলভ ও তাঁর ছাত্ররা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যথেষ্ট আগ্রহ ও ক্ষুধা ছাড়া জোর করে যে খাবার গ্রহণ করা হয় তাতে বিশেষ উপকার হয় না, কারণ 'পরিপাক রস ক্ষরণের পক্ষে পরিমাণ ও গুণ কোনো দিক থেকেই খাদ্য কামনার সঙ্গে কোনো উত্তেজকেরই তুলনা চলে না।'

ধমক দিয়ে বা বুঝিয়ে শুনিয়ে খেতে বসানো — এটা সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশুর পক্ষে হওয়া উচিত নয়। কথা কয়ে অথবা গল্প শুনিয়ে তাকে খাবার সময় ভোলানো কদাচ উচিত নয়। বরং তার মন টানার মতো সবকিছু জিনিস, খেলনা, বই, ছবি, এবং যে প্রিয় খাবারটা পরে খেতে দেবার কথা সেটাকেও তার সামনে থেকে সরিয়ে রাখা দরকার। শিশু যদি যান্ত্রিকভাবে খায় তাহলে পাভলভের গবেষণা অনুসারে পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাক হতে অনেক বেশি সময় লাগে।

শিশুর ব্যক্তিত্বের সাধারণ বিকাশের ক্ষেত্রে তার **স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা সর্বাধিক। দৈহিক লালনের অন্যতম একটা কর্তব্য হল তার স্নায়ুতন্ত্রকে অতি ক্লান্তি ও অতি উত্তেজনা থেকে রক্ষা করা।** কিন্তু পরিবারের মধ্যে শিশুলালনের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে স্নায়ুতন্ত্রের স্বাস্থ্য বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয় না, অথচ এ কথা ভোলা উচিত নয় যে শিশুদের স্নায়ু অতি ঘাতপ্রবণ। তার স্বভাবই হল সাধারণ চঞ্চলতা, অতি উত্তেজনশীলতা, অনুভূতিপ্রবণতা এবং দ্রুত ক্লান্তি। **ঘুম ও স্ফূর্তি, ছুটোছুটি ও অবকাশ, পড়াশুনা ও বিশ্রামের সঠিক পালাবদল না থাকা, তাজা হাওয়ার অপ্রতুলতা, পরিবারে শান্ত পরিবেশের অভাব প্রায়ই শিশুদের স্নায়ুবিকারের উৎস হয় এগুলি।** দুঃখের বিষয় কড়া করে দিনের একটা রুটিন মেনে চলার তাৎপর্য প্রায়ই তুচ্ছ করা হয়, বিশেষ করে যথেষ্ট ও সময়মত ঘুমের তাৎপর্য ছোটো করে দেখা হয়। শিশুরা প্রচুর শক্তিক্ষয় করে, খেলাধূলা করতে করতে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়লেও শিশুরা তা টের পায় না। স্নায়ুতন্ত্র ক্লান্ত হয় তীক্ষ্ন শব্দ, গোলমাল এবং পরিবেশের নানা ঘটনায়। তাই শিশুর পূর্ণ বিশ্রাম সম্ভব কেবল নির্বিঘ্ন ঘুমে। তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের ১২-১৩ ঘণ্টা আর ছয় সাত বছরের শিশুদের ১১-১২ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত। শিশুর

স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা-প্রবণতা এবং অবিরাম চঞ্চলতার দরুন হার্টের উপর অতিচাপের ফলে তাদের দিবানিদ্রা একান্ত প্রয়োজন। সোভিয়েত কিণ্ডারগার্টেনগুলিতে দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর শিশুরা বেলা দেড়টা থেকে তিনটে পর্যন্ত ঘুমোয়।

রাতে ঘুমতে শোয়ানো উচিত ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে, শীতকালে সন্ধ্যা ৮টায়, গরমে রাত ৯টায়। ঘুমের সঠিক সময় মেনে চললে, তাজা হাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে (আংশিক খোলা জানলা), কথাবার্তা কয়ে, বা গল্প শুনিয়ে মন বিক্ষিপ্ত না করলে, শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে শিশুদের।

বেড়াবার সময়টাও নির্দিষ্ট করতে পারলে ভালো। শীতকালে কম পক্ষে ৩½-৪ ঘণ্টা খোলা হাওয়ায় থাকা উচিত শিশুদের, গ্রীষ্মকালে গোটা দিনটাই বাইরে রাখতে পারাই বাঞ্ছনীয়।

সঠিক দৈহিক লালনের জন্য **শিশুর সক্রিয়তা** প্রয়োজন। শিশুর জন্য কেবল স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি ও ঠিক নিয়ম বন্ধন করে দিলেই হয় না, **নিজে নিজেই যাতে সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি পালন করে তার ব্যবস্থাও করা উচিত।** তিন চার বছর বয়স থেকেই সকালে ঘুম ভেঙে এবং রাতে ঘুমুতে যাবার আগে হাত মুখ ধোয়া, খাবার আগে এবং খেলাধুলায় হাত নোংরা হলে তা ধোয়া, নিজে নিজেই আস্তিন গুটিয়ে সাবান দিয়ে প্রথমে হাত পরে মুখ ধোয়া, তোয়ালে দিয়ে মোছা এবং যথাস্থানে তা টাঙিয়ে রাখা — এ সব তাদের শেখানো উচিত। খাবার পর এবং ঘুমতে যাবার আগে গরম জলে কুলকুচি করা এবং রুমাল ব্যবহার করতে পারা উচিত। এই বয়স থেকেই খাবার টেবিলে স্থির হয়ে বসতে, নিজে হাতেই সঠিকভাবে খেতে, ডান হাতে চামচ ধরতে, অল্প অল্প করে খাবার টেনে নিতে, ন্যাপকিনে মুখ মুছতে, চেয়ার থেকে উঠে যাবার সময় চেয়ারটি ফের যথাস্থানে সরিয়ে রাখতে এবং পরিশেষে ধন্যবাদ জানাতে শেখানো খুবই সম্ভব।

সন্দেহ নেই, এ সব অভ্যাস রপ্ত করে তুলতে হলে প্রথম প্রথম খুবই মনোযোগ দরকার। শিশুদের খুব পরিষ্কার করে দেখিয়ে দেওয়া উচিত কী করে জামার হাতা গুটাতে হয়, ধোয়া পাকলার পর কী ভাবে হাত মুছে শুকিয়ে নিতে হয়, তারপর শিশু যদ্দিন না অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে ততদিন অভ্যাস রপ্ত করার ওপর নিয়মিত নজর রাখতে হয়।

আটটা বেজেছে, শোবার পালা!

এই ভাবে শিশুদের নিত্যকার রুটিনের মধ্যে কেবল আহার, নিদ্রা, ভ্রমণ, ক্রীড়া ও পড়াশুনার সময় বেঁধে দিলেই হবে না, নির্দিষ্ট কতকগুলি স্বাস্থ্যবিধি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, এবং সভ্য আচরণের রীতিও তাদের পালন করা চাই।

ছোটো বয়স থেকেই নিয়ম মেনে চলার শিক্ষা পেলে তাদের মধ্যে গোছগাছ, শৃঙ্খলা, স্ফূর্তি, আচরণের দৃঢ়তা এবং যে কোনো একটা অভ্যাস রপ্ত করতে গেলে যে দুরূহতা সম্ভব তা জয় করার প্রবণতা গড়ে উঠবে।

মা-বাপের প্রধান দায়িত্ব হল শিশুদের পক্ষে কঠিন নয় এমন কতকগুলি সুচিন্তিত নিয়ম স্থির করা এবং নিয়মিতভাবে তা পালন করিয়ে নেওয়া।

বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে **আজ একটা নিয়ম চালু করে কাল তা ভুলে গেলে, আজ নিষিদ্ধ করে কালই আবার তা মঞ্জুর করলে শিশুদের মধ্যে কখনো পাকা অভ্যাস গড়ে তোলা যায় না।** এই রকম অসঙ্গতির ভিত্তিতেই সাধারণত ঝোঁক-ধরা, অবাধ্য, জেদী ছেলেমেয়ে গড়ে ওঠে। শিশুরা

চট করে বুঝে ফেলে যে কেঁদে কেটে, ঝোঁক ধরে বা মিনতি করে বাপ-মায়ের কাছ থেকে নিয়ম লঙ্ঘনের অনুমতি মেলে, যেটা তার পক্ষে ক্ষতিকর, নিষিদ্ধ, তা করতে পারা যায়। এই ভাবে ঘুম ভাঙতেই বিছানা না ছেড়ে গড়াগড়ি দিতে, অসময়ে লজেন্স চাইতে, কর্তব্য বা নিয়ম না পালনের অজুহাত খুঁজতে, জিনিসপত্র বা খেলনাপাতি না গুছিয়ে এলোমেলো ফেলে রাখতে অভ্যস্ত হয়ে যায় শিশুরা।

এই ধরনের নেতিবাচক অভ্যাস পরিহার করা সম্ভব কেবল নিখুঁত রুটিন পালনের ওপর নজর রেখে, শিশুর উপর যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার কঠোর সঙ্গতি মেনে এবং প্রণালীবদ্ধভাবে তাকে পরিচালিত করে।

তিন বছরের মেয়েটির ব্যাপারে জনৈক মায়ের একটা পর্যবেক্ষণ দেওয়া গেল, 'লিউবার কতকগুলি স্বাবলম্বী অভ্যাস আছে: সঠিকভাবে চামচ ধরতে, ইজের, জুতো, পোষাক পরতে পারে, কিন্তু এ অভ্যাস তার যে বেশ পাকা তা বলতে পারি না।

'মেয়েটির জন্মের শুরু থেকেই তার বিকাশ ও আমাদের লালনের ফলাফল দেখে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে শিশুদের অভ্যাস তখনই স্থায়ী হয় যখন সে অভ্যাসের অনুশীলন অবিচ্ছিন্নভাবে চলে, এবং যত ঘন ঘন তাতে ছেদ পড়ে স্থায়ী অভ্যাস গড়া ততই দুরূহ হয়।

'বসন্তের গোড়ায় যখন বরফ গলে কাদা কাদা হয়ে উঠছে তখন আমরা বাগান বাড়িতে চলে আসি। আমরা সবাই লক্ষ্য রাখতাম যাতে দোরগোড়ায় পাপোশে পা মুছতে লিউবা না ভোলে। বেশ আগ্রহ করেই মেয়েটা সযত্নে পা মুছে ঢুকত। অচিরেই কথাটা তাকে আর বলে দিতে হত না তাই নয়, কেউ পা না মুছে ঘরে ঢুকলে সে নিজেই ভৎর্সনা করত, "পা মুছে ঢুকতে হয়। শুরা কাকী ধুয়ে মুছে মেজে পরিষ্কার করে রেখেছে।"

'তারপর শুরু হল অপরূপ গ্রীষ্ম আবহাওয়া। বাগান বাড়ির রাস্তাটায় আমরা বালি বিছিয়ে দিই, পা মুছে ঢোকার দিকে তেমন আর লক্ষ্য ছিল না। ফের যখন বর্ষা শুরু হল তখন কথাটা আবার মনে করিয়ে দিতে হল লিউবাকে।

'আমরা সবাই ওকে শিখিয়েছিলাম, কিছু একটা চাইতে হলে ধীরভাবে বলতে হয়, "দয়া করে দিন।" এটা সে ভালোই রপ্ত করলে। আরেকটি মেয়ে

ছিল সাধারণত ঝোঁক-ধরা। কাঁদুনে গলায়, "লজেন্স খাব, লজেন্স খাব" বলে সে ঝোঁক ধরতে লিউবা ভর্ৎসনা করে বলেছিল, "দয়া করে দিন বলতে পারে না ওলিয়া।" কিন্তু লিউবার জীবনে এরপর এল তার কাকী শুরা। তার সঙ্গেই বেশি সময়টা থাকত সে।

'ছেলেপিলেদের সঙ্গে কী ভাবে চলতে হয় তা সে জানত না, নিজের কাজেই সাধারণত ব্যস্ত থাকত, তাই মেয়েটি যখন শান্তভাবে ভদ্রতা করে কিছু চাইত তখন সেটায় সে প্রায়ই নজর দিত না, অথচ শিশুর কান্নায় সে ভয়ানক ভয় পেত। কাঁদুনে সুর ধরলেই সে অবিলম্বে শিশুর প্রার্থনা মেটাতে দেরি করত না, আর সেই সঙ্গে লিউবার চরিত্রও বদলে গেল। কিছু একটা পাবার ইচ্ছে হলেই সে এবার সরবে কাঁদুনি ধরত, "আপেল খাবো। আমায় আপেল দিচ্ছে না — এ্যাঁ।" এই নতুন কু-অভ্যাসটা ওর ছাড়াতে হল সবাই মিলে। কাঁদুনি সুর ধরলেই আমরা থামিয়ে দিয়ে বলতাম, "কী ভাবে চাইতে হয় মনে আছে?" ও যখন না কেঁদে শান্তভাবে বলত, "দয়া করে দিন" কেবল তখনই আমরা ওর ইচ্ছে মেটাতাম, অবশ্য সে ইচ্ছে যদি অন্যায় না হত।

'অন্যান্য অভ্যাসের ব্যাপারেও একই কথা, লিউবাকে আমরা সঠিকভাবে চামচ ধরতে শেখাই খুব ধৈর্য ধরে, প্রতিদিন দেখিয়ে দিতাম, মনে করিয়ে দিতাম, ঠিক করে দিতাম, কিন্তু মাঝখানে একবার দিন কয়েক ও নিজের মত রইল, তারপর ফের দেখা গেল খাবার সময় ও চামচ ধরছে মুঠো করে। নিজে নিজেই পোষাক পরার ঝোঁক ছিল মেয়েটার, কিন্তু সে অভ্যাসটি তার টিকতে পেল না (ধৈর্য ধরে শিশুকে পোষাক পরতে শেখানোর চাইতে পোষাক পরিয়ে দেওয়া অনেক সোজা) আর এখন লিউবা প্রত্যেকবার অপেক্ষা করে বসে থাকে, কেউ ওকে পোষাক পরিয়ে দেবে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, একটা অভ্যাস ভেঙে অন্য একটা অভ্যাস গড়ে উঠলে সে অভ্যাস ফের ফিরিয়ে আনা অনেক কষ্টকর, কারণ সেক্ষেত্রে শেখাবার আগে রপ্ত অভ্যাস কাটাতে হয়।'

এই পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যাবে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির কয়েকগুলি অভ্যাস অনেক ছোটো থেকেই গড়ে তোলা যায়, ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দিয়ে, বার বার মনে করিয়ে এবং সঠিকভাবে তা পালনের উপর

নিয়মিত নজর রেখে, কিন্তু শিশু যত ছোটো ততই তার আচরণ হয় অস্থির ও অনিচ্ছাকৃত, তাই মা-বাপ ও সংসারের অন্যান্য লোকেদের পরিচালনা হওয়া চাই অটল ও সুসঙ্গত, কেননা একটা অভ্যাস গড়ে ওঠার চাইতে সে অভ্যাস নষ্ট হওয়া অনেক সহজ।

এ সব থেকে দাঁড়ায় এই যে, কঠোর নিয়ম বেঁধে অটলভাবে পালন করিয়ে নেওয়াটা কেবল শিশুর সঠিক দৈহিক লালনের জন্যই নয় তার নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গুণ বিকাশেরও মূল শর্ত।

এবার পরের প্রশ্নে যাওয়া যাক — অনধিক সাত বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের কি শ্রম-শিক্ষা দেওয়া যায়?

এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শ্রম হয় চিত্তাকর্ষক, সাধ্যায়ত্ত এবং সেই সঙ্গে সে শ্রম কেবল যান্ত্রিক নয় সৃজনশীল হওয়া উচিত।

ন. ক. ক্রুপস্কায়া

শৈশব থেকেই শ্রম-শিক্ষা

স্কুলে যাবার মতো বয়স হবার আগে থেকেই শিশুর সঠিক শ্রমাভ্যাস হল তার সর্বাঙ্গীন ও সুসঙ্গত বিকাশের এক মূল শর্ত। শারীরিক ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যায়ত্ত শ্রমের ফলে শিশুর দৈহিক গড়ন শক্ত হয়, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ওপর দখল আসে, ক্ষিপ্র, পটু ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে সে। শ্রমের ফলে স্নায়ুতন্ত্রের ওপর শুভপ্রভাব পড়ে এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি পালন ও অন্যান্য সদগুণের অভ্যাস পাকা হয়।

বলা একান্তই বাহুল্য যে এক্ষেত্রে শিশুর পক্ষে যা সাধ্য কেবল তেমন শ্রমের কথাই বলা হচ্ছে।

পারিবারিক যৌথ সঠিকভাবে সংগঠিত হলে তার প্রতিটি সদস্য সাধারণ ভাণ্ডারে যোগ করে তার সাধ্যায়ত্ত অবদান, প্রত্যেকেরই থাকে এক একটা নির্দিষ্ট দায়িত্ব। অতি ছোটো থেকেই শিশুকেও তেমন একটা দায়িত্ব দেওয়া উচিত, তা সে দায়িত্ব যত ন্যূনতমই হোক না কেন। এতে বয়স্কদের শ্রমকে শ্রদ্ধা করতে শেখে শিশু, মা-বাপ দাদু দিদিমা তথা ছোটো ভাইবোনদের প্রতি যত্নশীল হয়ে ওঠে। কেবল এই পরিস্থিতিতেই শিশু টের পায় যে সে পরিবারের একজন প্রয়োজনীয় সদস্য, পরিবারের আর সকলের হিতার্থে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়, নিতান্ত এক স্বার্থপর 'নবাবপুত্তুর' হয়ে বেড়ে ওঠে না। এরূপ সহায়তার বাস্তব মূল্য অবশ্য অতি অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ

নেই, কিন্তু প্রশ্নটা এখানে বৈষয়িক লাভালাভের নয়, শিশুর নৈতিক গুণাবলী গঠনের পক্ষে যৌথ শ্রমে তার যোগদানের তাৎপর্য কত বিপুল সেই হল প্রশ্ন।

যৌথের কাছে নিজের স্বল্প কর্তব্যটুকু দায়িত্বের সঙ্গে পালন করতে শেখে সে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থটাকে সমগ্রের অধীন করতে, অপরের শ্রমকে শ্রদ্ধা করতে ও দুরূহতা জয় করতে অভ্যস্ত হয়। এই ভাবে শৈশব থেকেই তার মধ্যে শ্রমের প্রতি একটা সচেতন সানন্দ দৃষ্টিভঙ্গির বনিয়াদ রচিত হয়ে ওঠে।

এই বয়সের শিশুদের যা বৈশিষ্ট্য সেটা এরূপ শ্রমশিক্ষার পক্ষে একান্ত অনুকূল। শিশুর স্বভাবই হল সক্রিয়তা ও কৌতূহল, সবই সে নিজে করে দেখতে চায়। যা দেখে তারই সে অনুকরণ করে এবং এইভাবে অর্জন করে নিজের প্রথম অভিজ্ঞতা, প্রথম অভ্যাস। বড়োদের শ্রম দেখে শিশুরা সাধারণতই তাতে যোগ দিতে চায়, নিজেকে বড়োদের মতো করে দেখতে চায় সে। শিশুর জামাকাপড় কাচতে গেছে মা, শিশুও ঠিক তার পেছন পেছন। 'আমি মায়ের মত করব।' বাপ বাগানে চারা পুঁতছে, শিশু কিছুতেই ছাড়বে না, 'আমিও পুঁতব।' শিশুদের মধ্যে যারা সাতের কাছাকাছি তারা সচেতনভাবেই নিজের স্বার্থকে পরিবারের স্বার্থাধীন করতে পারে: সঙ্গীরা খেলতে ডাকছে, খুকুমণি কিন্তু সচেতনভাবেই তার কর্তব্য মেনে না করছে, 'উঁহুঁ, যাব না, মা বাইরে গেছে, ছোটো বোনটাকে দেখতে বলে গেছে।' খেলার টান প্রবল, তাহলেও খোকন জানে এবার গিয়ে টেবিল পাততে সাহায্য করা উচিত মাকে, আর সচেতনভাবে এ কর্তব্যটুকু সে পালন করে। এই বৈশিষ্ট্যের ফলে অতি ছোটো থেকেই শ্রমের প্রতি একটা সানন্দ নিঃস্বার্থ মনোভাব ও প্রাথমিক শ্রমাভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

অনধিক সাত বছর বয়সের শিশুদের শ্রম তার খেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জড়িত। শিশুরা প্রায়ই শ্রম করতে করতেই খেলে এবং খেলতে খেলতেই শ্রম করে যায়। এর ফলে শ্রমের প্রতি একটা অনুকূল সৃজনশীল মনোভাব এবং লক্ষ্যার্জনে অধ্যবসায় জাগিয়ে তোলা সহজ হয়। নিজের প্রিয় ভালুকটির জন্যে ঘর বানাতে শিশু কী পরিশ্রম করতেই না রাজী। ঘরটি গড়ে তুলতে কত তার অধ্যবসায়, ঘর শেষ হলে কতই না তার আনন্দ! দিদিমার তত্ত্বাবধানে লিদাও তার খেলনা কলে কাপড় সেলাই করছে তার পুতুলদের জন্যে।

শ্রম-ক্রীড়ার মাধ্যমে কত হিতকর অভ্যাস ও নৈতিক গুণই না অর্জন করতে পারে শিশুরা। প্রয়োজন কেবল সযত্নে সমনোযোগে এই প্রবণতাকে চালনা করা, শিশুদের স্বাভাবিক সক্রিয়তাকে দমন না করে তার পথ কেটে দেওয়া।

শারীরিক ব্যায়াম ও ছুটাছুটির খেলার মধ্যে দিয়ে যে সব গুণ গড়ে ওঠে, যথা দৃষ্টির তীক্ষ্নতা, হাতের ক্ষিপ্রতা, অঙ্গসঞ্চালনের সমন্বয় ইত্যাদি শ্রমাভ্যাস অর্জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

সঠিক শ্রমশিক্ষা আর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ উভয় উভয়ের উপর সক্রিয়। শিশুর শ্রম এমন ভাবে সংগঠিত করা উচিত যাতে তার মধ্য দিয়ে শিশুর অনুসন্ধিৎসা, কল্পনাশক্তি, পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য গুণ বিকশিত হয়।

শ্রম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সব অভ্যাস ও নৈপুণ্য গড়ে ওঠে তা পরবর্তী কালে বিদ্যালয়ে শিক্ষার পক্ষে অতি কার্যকরী।

প্রথম শ্রেণীর কিছু শিশুকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছিল আমাদের, এরা আগেই পরিবারের মধ্যে শ্রমের শিক্ষা, নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের শিক্ষা পেয়েছিল কিন্তু তখনো পড়তে পারত না। আবার অন্য শিশুও ছিল যার পরিবারে শ্রম শিক্ষা উপেক্ষা করা হয়েছিল কিন্তু শিশুটি পড়তে পারত, সংসারের সবাই তাকে ভাবত বয়সের তুলনায় 'বুদ্ধিমান'।

কিন্তু কী দাঁড়াত? শেষ পর্যন্ত দেখা যেত যে 'বুদ্ধিমানেরা' প্রাথমিক শ্রেণীতে প্রায়ই পেছিয়ে পড়ছে।

তার কারণ কী? শ্রমাভ্যস্ত শিশুরা ছিল মনোযোগী, শিক্ষিকা যে কাজ দিতেন তা মন দিয়ে পূরণ করত, বই খাতা সঠিকভাবে গুছিয়ে রাখত, নোংরা করত না। এটা ঘটত, কারণ শ্রম দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার সময় এ শিশুরা আগেই খানিকটা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের অভ্যাস, মা-বাপের নির্দেশ নিখুঁতভাবে পালনের অভ্যাস রপ্ত করে এসেছিল। এদের দায়িত্ব বোধ, সচেতন মনোযোগ, পর্যবেক্ষণশীলতা ছিল বেশি, যা ছাড়া স্কুলের শিক্ষায় সাফল্য সম্ভব নয়।

শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি পরিবেশের জীবন থেকে বিছিন্ন হয়ে বিকাশ পায় না। শিশু চিন্তা করে প্রত্যক্ষ চিত্রকল্পে। চারিপাশের জীবন সম্পর্কে তার পর্যবেক্ষণ যত প্রসারিত, ততই তার চিন্তার সুবিকাশ ঘটে। গাছপালা, জীবজন্তুর পরিচর্যায় শিশু যে প্রত্যক্ষ শ্রম করে, চারিপাশের লোকজনের
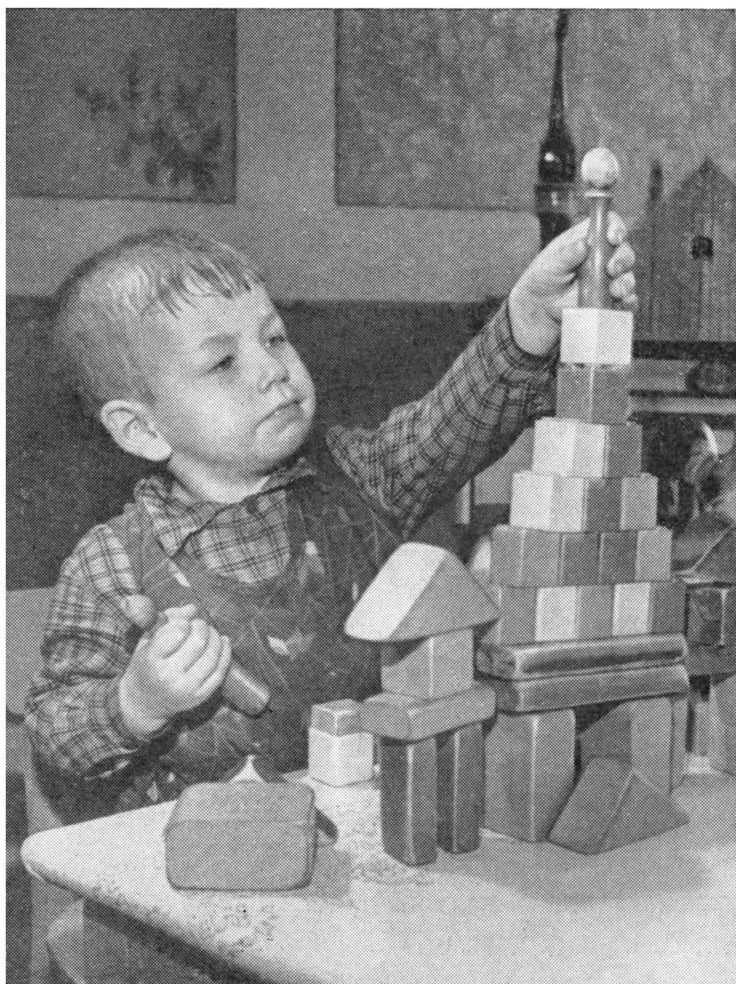
দাঁড়াও, কেল্লা বানাই!

পরিশ্রম সে যে পর্যবেক্ষণ করে দেখে, তাতে সে অনেক প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে। প্রতিটি মানুষের পক্ষে শ্রম যে অপরিহার্য এ কথা তার মনে ধীরে ধীরে গেঁথে দেয় তার মা-বাপ। প্রকৃতির ব্যাপারে, প্রকৃতির নিয়মশাসিত ঘটনাবলী সম্পর্কে আগ্রহ জাগতে শুরু করে তার মনে, সঠিক বস্তুবাদী চিন্তার বনিয়াদ গড়ে ওঠে তাতে। শ্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলে যন্ত্র কৌশলে আগ্রহ বাড়ে, নিজের শ্রমাভ্যাসকে উন্নত করতে সাহায্য হয়। নানা ধরনের নির্মাণ মালমশলা নিয়ে খেলার মধ্যে দিয়ে উদ্ভাবন শক্তি বেড়ে ওঠে তার। এ সবই হল পলিটেকনিক শ্রম বিদ্যালয়ে প্রবেশের একটা প্রস্তুতি পর্ব।

অবশ্যই স্কুলে যে ভাবে পলিটেকনিক শিক্ষা ও উৎপাদনী শ্রমকে দেখা হয় অনধিক সাত বছর বয়সের শিশুদের পক্ষে সে প্রশ্নই ওঠে না বটে, কিন্তু এই বয়স থেকেই তার শ্রম শিক্ষা শুরু হওয়া চাই।

সোভিয়েত শিক্ষণবিদ্যার বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ন. ক. ক্রুপস্কায়া (১৮৬৯-১৯৩৯) বিশদভাবে বলেছেন শিশুদের পক্ষে, তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কতকগুলি নৈতিক গুণ গড়ে তোলার জন্য, পলিটেকনিক শ্রম বিদ্যালয়ের জন্য তাদের প্রস্তুত করে তোলার পক্ষে যৌথশ্রমের তাৎপর্য কত বিপুল।

কায়িক শ্রমের প্রতি অশ্রদ্ধার যে মনোভাব তার বিরুদ্ধে সব রকমে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন তিনি।

যন্ত্র কৌশলের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে সে আগ্রহকে নিত্যকার সাংসারিক কাজের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে মেলানো প্রয়োজন বলে গণ্য করেছেন তিনি, 'কর্মপটু হাত' গড়ে তোলা এবং 'নিজের কাজ নিজে করার প্রতি লাটসায়েবী মনোভাবের' জের মুছে ফেলার প্রয়োজনীয়তায় তিনি জোর দেন।

সোভিয়েত কিণ্ডারগার্টেন ও পরিবারে শ্রম শিক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, তিন চার বছর বয়স থেকেই শিশুরা নিজের কাজ নিজে করতে পারে; নিজের খেলার কোণটি গুছিয়ে রাখে, নিজে নিজেই জামাকাপড় পরে, পোষাক ছাড়ে ইত্যাদি।

ছয় সাত বছরের শিশু তো বটেই, বছর পাঁচেক বয়সের শিশুর পক্ষেও চায়ের পেয়ালা ধোয়া, টেবিল পাতা, রান্নাবান্নার কাজে কিছু সাহায্য করা, ছোটোখাটো কাপড় কাচা ইত্যাদি সাংসারিক কাজ খুবই সাধ্যায়ত্ত। যন্ত্রপাতি

সমেত যে সাংসারিক কাজ সেইটাই বিশেষ করে শিশুদের পছন্দ। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে মেজে পরিষ্কার করতে অথবা মায়ের অভিভাবকত্বে ইলেকট্রিক ইস্ত্রি দিয়ে ছোটোখাটো জিনিস ইস্ত্রি করতে কী ভালোই না তারা বাসে।

প্রকৃতির ক্ষেত্রে ছেলেদের যে পরিশ্রম সেটা বিশেষ মনোযোগের বিষয়। এটা ভালো রকম সংগঠিত করতে পারলে শিশুরা তাতে মেতে ওঠে। ভুঁই তৈরি করা, বীজ বোনা, অংকুর উদ্‌গমের ওপর নজর রাখা, চারাগুলির যত্ন করা, কী রকম জল বা আলো তাদের দরকার সেটা শিখে নেওয়া — এই সবের ফলে বাগানের যে পরিশ্রম তাতে শিশুর দৃষ্টি পরিধি প্রসারিত হয়ে হিতকর পর্যবেক্ষণ জমে ওঠে তার। অবিশ্যি সকল সংসারেই ঘরোয়া বাগান আছে এমন নয়। কিন্তু জানলার বাজুতে টব বা কাঠের বাক্সে কিছু কিছু ওট, মটর বরবটি বোনা যায়, পেঁয়াজ, গাজর বীট পোঁতা যায়, তার পরিচর্যার ভার দেওয়া যায় শিশুদের ওপর — এ কাজটা যেমন উপকারী তেমনি জরুরী।

তবে ব্যাপারটার এমন ভাবে ব্যবস্থা করা উচিত যাতে শিশুরা নিজেদের দায়িত্বটা বুঝতে পারে, খেলায় ভুলে তাতে অবহেলা না করে।

কী দরকার সেটা বেশ জানা থাকলেও মা-বাপে মাঝে মাঝে তা পূরণের মতো পরিস্থিতি গড়ে দিতে ভুলে যায়। শিশুটি নিজে নিজেই যাতে পোষাক পরে এটা দাবি করা হল কিন্তু পোষাক আশাক কোথায় থাকবে তার একটা নির্দিষ্ট জায়গা রইল না। চায়ের বাসন ধোয়ার ভার দেওয়া হল খুকিকে, কিন্তু সেটা পূরণ হল না, কারণ বাসন ধোয়ার গামলা, মোছার তোয়ালে যে কোথায় তা খুঁজে পেল না খুকি।

ঘর ফিটফাট পরিচ্ছন্ন রাখা, অপ্রয়োজনীয় বাজে জিনিসে তা বোঝাই না করা, যেটা দরকার সেটা ফের ঠিক জায়গাটিতে রেখে দেওয়া, কঠোরভাবে নিয়ম মেনে চলা — এটা দেখা মা-বাপ এবং সংসারের প্রতিটি সদস্যের কর্তব্য। কেবল এই শর্তেই শিশুর কাছে নিয়ম পালনের দাবি করা সম্ভব। এটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছোটো বয়সে যখন শিশুরা সবে নিজের কাজ নিজে করার অভ্যাস রপ্ত করতে শিখছে। রাতে পোষাক ছাড়ার কাজটা হওয়া উচিত একটা নির্দিষ্ট রীতি মেনে, প্রথমে ফ্রক বা জামাটি ছাড়া, তারপর জুতো, ইজের, ফতুয়া, মোজা। ফ্রক এবং আন্ডারওয়ার চেয়ারের পিঠে এমন
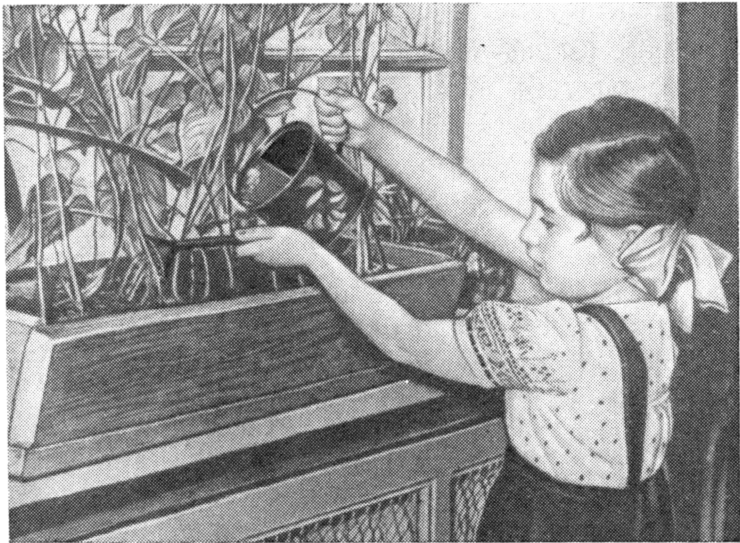
ঘরোয়া টবে বরবটির চাষ!

ভাবে গুছিয়ে রাখা চাই যাতে সকালে পরবার সময় শিশুর অসুবিধা না হয়, মোজা রাখা উচিত চেয়ারের আসনে, জুতো চেয়ারের নিচে।

নিখুঁত রুটিন ও আপন কাজ আপনি করায় যে সব শিশু অভ্যস্ত হয় তারা সাধারণত সারা জীবন তাদের গোছগাছের স্বভাব বজায় রাখে। সঠিকভাবে নজর রাখলে শিশুদের মধ্যে এ অভ্যাস খুব ছোটোতেই গড়ে ওঠে।

সবচেয়ে ছোটোদের গ্রুপের শিক্ষিকা ত. বাতিশ্চেভা তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেছেন, 'অচিরেই লক্ষ্য করলাম যে নিনা নিজে নিজেই তার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে পারে, অথচ বয়সে সে সবার ছোটো, অল্পদিন হল কিন্ডারগার্টেনে এসেছে।'

খুকির বাড়ি গিয়ে শিক্ষয়িত্রী বুঝলেন তার এই গোছগাছ স্বভাবের উৎস কী। ঘরখানা তাদের ভারি ফিটফাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নিনার জন্যে আলাদা জায়গা, খাট, ছোট্ট একটি টেবিল। টেবিলে রঙীন পেনসিল, খাতা। 'এটা আমাদের নিনার জায়গা,' মা দেখালেন, 'আমার কাছে সন্ধ্যাবেলায় আর

ছুটির দিনে সে এখানে পড়াশুনা করে। দুজনে মিলে আমরা এখানে বই উলটিয়ে দেখি, কখনো কখনো ওকে পড়ে শোনাই।' দেয়ালে বইয়ের ব্যাগ, মোটা কাগজের সঙ্গে সিল্কের ফিতে সেলাই করে তৈরি। বই বার করলে নিনা, সবকটি বই একেবারে নতুনের মতো, যদিও তা কেনা হয়েছে অনেক আগে। ছোটো থেকেই মা তাকে শিখিয়েছে বইপত্তর খেলনাপাতি নষ্ট না করতে, জায়গা মতো গুছিয়ে রাখতে।

পরিবারের বড়োদের প্রতি শিশুর স্বাভাবিক সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত যাতে সে তাদের শ্রমকে শ্রদ্ধা করে, সাহায্য করতে চায়, সেবা করতে প্রস্তুত থাকে, মা-বাপের বিশ্রামে বিঘ্ন না ঘটায়। বাতিশ্চেভা বলেছেন, 'নিনাদের বাড়ি যখন গেলাম, তখন দেখি নিনার মা ঘুমুচ্ছেন আর নিনা নিঃশব্দে চায়ের বাসন ধুয়ে মুছে রাখছে। আমায় দেখে সে সানন্দে ছুটে এল, আস্তে করে বললে, "চলুন আপনাকে আমার জায়গাটা দেখাব। খুব আস্তে আস্তে যাব কিন্তু, মা ঘুমুচ্ছে কিনা, কাজ থেকে ফিরেছে খুব ক্লান্ত হয়ে।"'

মা-বাপকে আসল সাহায্য শিশু আর কতটুকুই বা করতে পারে, কিন্তু সাধ্যমতো যেটুকু ভার সে পায় তাই সে সানন্দে সাগ্রহে পালন করে। মা-বাপে দাদা দিদি যাতে তার একাজে উৎসাহ দেয় সেটা খুব জরুরী। লিদার দু বছর বয়সও নয়, অথচ এখনই সে মা-বাপকে 'সাহায্য' করে; মা-বাপ কাজ থেকে ফিরে ঘরে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই লিদা তাদের চটি নিয়ে হাজির। মা-বাপে ধন্যবাদ দেয় তার এই সেবায়। বাপের আগমন লিদার চোখে না পড়লে বাপ খুব দুঃখের ভাব করে বলে, 'কী করি এখন, চটি যে দেখছি না, কোথায় খুঁজি বলো তো?' বলতে না বলতেই লিদা টুক টুক করে এসে হাজির, তার সাহায্য ছাড়া যে বাপের চলে না এতে সে ভারি খুশি। দিদিমাকেও সাগ্রহে 'সাহায্য' করে লিদা। খাবারের সময় টেবিল ক্লথ পেতে দিদিমা বলেন, 'আর টেবিলে চামচগুলো কে আনে?' লিদাও সানন্দে চামচ এনে একটার পর একটা রেখে বলে, 'এটা বাবার, এটা মার, এটা দিদিমার, এটা লিদার।'

চার বছরের লিউদার বৈশিষ্ট্য হল 'সাহায্য' করতে চাওয়া। তার সাহায্যে মা-বাপের প্রায়ই অনেক ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হলেও তারা তার এ উৎসাহ সমর্থন করেই এসেছে।

মা কাপড় কাচতে শুরু করলেই হল, অমনি লিউদা এসে হাজির: 'আমি সাহায্য করব।' বলাই বাহুল্য কাপড় কাচার ব্যাপারে যেখানে জল নিয়ে কারবার সেখানে তার সাহায্যে ঝামেলা হবে বইকি। অতটুকু বাচ্চা, ফ্রক যাতে না ভিজোয়, মেজের ওপর যাতে জল না ফেলে তা দেখা কম মুশকিল নয়, তাহলেও মা তাকে এগিয়ে দেয় ছোট্টো একটা গামলা আর পুতুলের পোষাক, নয়ত পরিষ্কার কিছু টুকিটাকি কাপড়। খুকিও সানন্দে তার টুকিটাকি কাপড়গুলোকে জলে চোবায়, জল নিঙরোয়, দড়িতে টাঙিয়ে রাখে, তার পর দড়ি থেকে নামিয়ে ফের আবার ধোয়া, নিঙরনো, টাঙানো।

'কাজ পেয়ে মেয়ে খুশি,' মা বলেন, 'আমিও মাঝে মাঝে উৎসাহ দিই — দিব্যি কেচেছিস তো রুমালটা। দেখ আমায় কেমন সাহায্য করে লিউদা। সুন্দর পরিষ্কার পোষাক হবে এবার তোর পুতুলের!

'দুজনে মিলে আমরা সেলাই-ও করি। আমার কাজের সঙ্গে সঙ্গে লিউদার ওপর নজর রাখা সম্ভব হলে আমি তার ইচ্ছা পূরণ করি। তাকে একটা ভোঁতা সূঁচ আর দোপাট্টা গিঁট বাঁধা সুতো দিয়ে কতকগুলো ছাঁট জুড়তে দিই। সেও সাগ্রহে কাজে লাগে। তবে বাপের সঙ্গে কাজ করতেই লিউদার আগ্রহ বেশি।

'মানতে বাধ্য যে এতে অনেক ধৈর্য দরকার, কিন্তু ভবিষ্যতে ভালো হবে এটা বুঝতাম। চার বছর বয়সেই আমরা লিউদাকে পারিবারিক যৌথের এক সদস্য বলে অনুভব করতাম, বড়োদের কাজে সাধ্যমত সাহায্য করার জন্য তার যে যত্ন ও চেষ্টা, সেটায় ওরও আনন্দ আমাদেরও আনন্দ। বড়োদের কেউ বালতি নিয়ে কুয়োর দিকে যেতে গেলেই সেও তার ছোট্ট বালতি হাতে হাজির হবে, "আমিও জল এনে দেব মার জন্যে।" আমাদের পড়শী একদিন ঝর্ণায় জল আনতে যাবে। লিউদাও তার বালতি নিয়ে মিনতি করলে সেও সঙ্গে যেতে চায়। ওর এই উৎসাহ দেখে আমার আনন্দ হল। তার আনা জলটি আমি কেটলিতে ঢাললাম, তারপর খুব করে আমরা তারিফ করলাম, "আহ, ঝর্ণার জলে চা যা হয়েছে চমৎকার! এ জল কে নিয়ে এসেছে? — লিউদা!" কাল আমি ওর প্লেটে টক ক্রীম দিচ্ছিলাম। এটা ও খুব ভালোবাসে তাহলেও আমায় থামিয়ে বললে, "সব দিয়ো না, বাবার জন্য রেখো।" তার বাবা মাঝে মাঝে প্রাতরাশ না খেয়ে বেরয়। খুব ভোরে কাজে যেতে হয়। লিউদার খাটের

মায়ের জন্যে জল আনতে যাচ্ছি

কাছে সে বিদায় নেবার জন্যে এলে লিউদা ঘুম ঘুম চোখেই জিজ্ঞেস করবে, "খেয়েছো তো?" মাঝে মাঝে বেশ কিছুটা উপস্থিত বুদ্ধিও দেখায় লিউদা। আমি একদিন মেজে পরিষ্কার করছিলাম, কিন্তু ময়লা তোলার হাতাটা ভুলে এসেছিলাম। আবর্জনার স্তূপটা জড়ো করে ভাবছিলাম কী দিয়ে তুলি। লিউদা চটপট ছুটে এসে আমায় দিলে একটা কার্ডবোর্ড, তাতে ভালোই কাজ চলল।'

ছেলেমেয়েদের জন্যে সহজসাধ্য দায়িত্ব স্থির করার সময় ঐ বয়সের শিশুদের বৈশিষ্ট্য এবং নির্দিষ্ট শিশুটির ব্যক্তিগত বাস্তব সম্ভাবনা ভালো করে ভেবে দেখা উচিত।

পরিবারের কর্তব্য হল — **শ্রমের প্রতি শিশুর একটা সানন্দ সৃজনশীল মনোভাব গড়ে তোলা** এবং সে শ্রম হতে পারে কেবল **সাধ্যায়ত্ত** শ্রম, যার উদ্দেশ্য শিশুকে মানুষ করে তোলা, যা থেকে শিশু তৃপ্তি পাবে এই দেখে যে সেও উপকারে লাগছে এবং দুরূহতা জয় করতে পারছে।

শিশুর কাছে বহু কিছু দাবি করা উচিত নয়, কিন্তু যে দায়িত্বটুকু তার ধার্য হল সেটার পরিপূরণের উপর দৈনন্দিন নজর রাখা মা-বাপের কর্তব্য, **কেননা নিয়মিত অনুশীলন ছাড়া, নিজের দায়িত্ব পালনের জন্য নিজের প্রচেষ্টা ছাড়া, যৌথের প্রতি দৃঢ় দায়িত্ব বোধ ছাড়া শিশুর মধ্যে মূল্যবান ইচ্ছাশক্তি ও নৈতিক গুণ বিকাশ সম্ভব নয়।**

মা-বাপে শিশুর উপর যে দাবি করবে তাতে তার ব্যক্তিত্বের উপর জবরদস্তি করা হবে না বরং তার উপর আস্থা ও শ্রদ্ধাই প্রকাশ পাবে। আ. মাকারেঙ্কো লিখেছেন, 'যথা সম্ভব শ্রদ্ধা দেখাবে এবং অটলভাবে পরিষ্কার করে খোলাখুলি এই দাবি করবে: এইভাবে চলো, এই এই করো… যে সব সংসারে মা-বাপের কাছ থেকে এই ধরনের সুচিন্তিত দাবি থাকে সেখানে শিশুদের দিয়ে সহজেই সঠিকভাবে গুছিয়ে দায়িত্ব পালন করিয়ে নেওয়া যায়।'

তিন সন্তানের মা ও. কুজনেৎসভা বলেছেন, 'আমার ছেলেমেয়েদের উপর ন্যস্ত কাজের ভার ও দায়িত্ব পালনের ওপর আমি খুব সতর্ক নজর রাখি। জোর জবরদস্তি করে কাজ করিয়ে নেবার দিকে আমি কম যাই। তাদের অসাধ্য কাজ কখনো দিই না এবং প্রায়ই এইটে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করি যে

কোনো একটা ভার দিয়ে আমি শিশুটির উপর একটা বিশেষ রকম আস্থা দেখাচ্ছি।

'আমার মেজো মেয়ের যখন সাড়ে চার বছর বয়স, নিজের কাজ নিজে করার অনেক অভ্যাস তার যখন হয়েছে, তখন আমি তাকে বলি, "এবার তো তুই বড়ো হয়েছিস, নিজে নিজেই পোষাক আশাক পরতে, নিজের কোণটি ধুয়ে মুছে গুছিয়ে রাখতে পারিস। আমি আর কিছু সাহায্য করব না কিন্তু।" "বেশ তো আমিই করব," খুশি হয়ে উঠল মেয়ে।

'জুতোর ফিতে পরাবার মতো ঝামেলার ব্যাপারটা যে সে কী জেদে করত, বড়ো ভাইটি তাকে কোনো সাহায্য করতে এলে কী তেজেই যে সে তা প্রত্যাখ্যান করত, সেটা দেখবার মতো।

'আমার সিরিওজার ছয় বছর পূর্ণ হলে আমি বলি, "তুই আমার সঙ্গে এতদিন তো ফুলগাছগুলোর দেখা শোনা করেছিস, এবার যদি আমি আর না দেখি, একা একাই পারবি তো?" সেদিন থেকে এ ব্যাপারে আমায় হস্তক্ষেপ করে তার ভূমিকা ছোটো করার সুযোগ হয়নি।'

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে শিশুদের শ্রমশিক্ষার ব্যাপারে মা-বাপের বহু ভুলের কারণ হল শিশুর বয়সোচিত সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে দেখা। যেমন বহু চোখে পড়েছে, ছয় সাত বছরের শিশুকে মোজা পরাচ্ছে মা কি দিদিমা আর শিশু নিশ্চিন্তে কখনো এ পা কখনো অন্য পা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এটা ঘটে কেন? কারণ সময় থাকতে বড়োরা তার সক্রিয়তা, তার সাধ্যমতো সবকিছু নিজে করার প্রবণতায় নজর দেয়নি। 'আমি নিজে নিজে করব, আমি নিজে,' শিশুরা প্রথম প্রথম আপত্তি জানায় কিন্তু ক্রমশ তার এই অভ্যাস হয়ে যায় যে তার কাজটা অন্যে করে দেবে, ধরে নেয় সেইটেই উচিত।

কোনো কোনো মা-বাপে শিশুর ওপর একই ধরনের কাজ এমন অনেক চাপায়, যার জন্যে তার কোনো স্বাবলম্বন বা উদ্যোগ দরকার হয় না।

একঘেয়ে কাজে শিশু ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ তাতে সুগম হয় না। মাঝে মাঝে সাধ্যাতীত কাজ দেওয়া হয় শিশুকে, স্বভাবতই তার ফল হয় দায়িত্ব অপালন, অথচ ন্যস্ত কর্তব্যের জন্য দায়িত্ব বোধ ও আত্মশক্তিতে আস্থা জাগিয়ে তোলাই হল কর্তব্য।

এ সব থেকে বোঝা যায় যে অল্পবয়স থেকেই শিশুদের শ্রম ও স্বাবলম্বন শেখানো, শিশু কর্তৃক পারিবারিক যৌথের মধ্যে কতকগুলি সরল ভার ও নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন শিশু মানুষ করে তোলার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তবে এ বিষয়ে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিশুর রুটিনে গার্হস্থ্য কাজ ও শ্রমদায়িত্বের পরিমাণটা যেন অতিরিক্ত জায়গা না নেয়।

শিশুর বয়সোচিত বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনার কথা মা-বাপের কখনো ভোলা উচিত নয়।

অনধিক সাত বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের পক্ষে পরম গুরুত্বপূর্ণ হল খেলাধুলা: খেলাই হল তাদের শিক্ষা, খেলাই তাদের শ্রম, মানুষ হয়ে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিই হল তাদের খেলা।

ন. ক. ক্রুপস্কায়া

শিশুদের খেলাধুলার পরিচালনা

স্কুলে ঢোকার আগে পর্যন্ত শিশুদের মূল ও বৈশিষ্ট্যসূচক সক্রিয়তা হল খেলা। তাদের দিনের রুটিনে এ খেলার একটা ভালোরকম স্থান থাকা চাই।

খেলাটা শিশুদের চাহিদা শুধু তাই নয়, তার সর্বাঙ্গীন বিকাশেরও একটা মূল পদ্ধতি।

খেলাই হল শিশুদের আনন্দের মূল উৎস। আর আনন্দ নইলে শিশু নেতিয়ে পড়ে রোদ ছাড়া ফুলের মতো।

হাসিখুশি, ক্ষিপ্র নিপুণ, শক্তসমর্থ ও গতিচঞ্চল হয়ে বাড়া চাই শিশুদের, স্কুলে ঢোকার আগে শিশুর মধ্যে এই গুণগুলি যথেষ্ট বিকশিত হয় খোলা হাওয়ায় ছুটোছুটির খেলায়। স্কিপিং এবং চোর-চোর খেলা শিশুরা কী ভীষণ ভালোবাসে তা সব মা-বাপেই জানে।

নৈতিক গুণ গড়ে তুলতেও খেলার ভূমিকা প্রচুর। খেলার মধ্যে দিয়ে বিকাশ পায় যৌথাভ্যাস, আত্মশৃঙখলা, উদ্যোগ। খেলার নিয়ম মেনে চলা চাই, সঙ্গীদের স্বার্থের কথা ভাবতে হয়, নিজের ভূমিকাটি পালন করতে হয়, বিঘ্ন জয় করতে হয়।

খেলার মর্মবস্তুটি কী এবং শিশুরা কী ভাবে খেলছে তার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে পরিবেশের প্রতি তার বিশেষ এক একটা মনোভাব, আচার

আচরণের বিশেষ এক একটা রীতি। নির্মাতা, বৈমানিক, নাবিক ইত্যাদির ভূমিকা নিয়ে খেলতে ভালোবাসে শিশুরা। যে ভূমিকাটি সে নেয় সেটায় সে সত্যি করেই প্রাণ ঢেলে দেয় এবং এটা তার চরিত্র গঠনে ছাপ না রেখে যায় না।

মানসিক বিকাশের ওপরেও খেলাধুলোর ছাপ থেকে যায়। ভালো খেলার জন্য দরকার কল্পনাশক্তি, মানসিক প্রচেষ্টা। শিশুরা খেলার মধ্যে পরিপার্শ্বের জীবন অনুকরণ করে থাকে, তার জন্য প্রয়োজন পর্যবেক্ষণ, স্মৃতি, যা দেখল তা পুনরুপস্থিত করার ক্ষমতা। বহু খেলায় দরকার হয় দ্রুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। খেলার সময় শিশুদের কথাবার্তা যে শুনেছে সেই জানে যে ঠিক খেলার সময়েই শিশুদের কথা ফোটে ভালো।

এসব থেকে বোঝা যায় যে শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে খেলার তাৎপর্য সত্যিই বিপুল, কিন্তু খেলায় শিশু আপনা থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেড়ে ওঠে একথা ভাবলে ভুল হবে। সব খেলাতেই শিশুর ওপর সুপ্রভাব পড়ে না। যেমন সঙ্গিনীদের সঙ্গে নেলীর যে খেলা তার মূলকথাটা এই রকম :

'নমস্কার, কেমন আছেন? নতুন কী খবর? আহ, আজ আমাদের বাসায় এমন হৈচৈ লেগে গিয়েছিল — একেবারে সাঙ্ঘাতিক।'

'মাগো, কী হয়েছিল?'

'জানেন, পিওতর স্তেপানভিচ মারিয়া নিকিফরভনাকে বলেছেন যে সে কেবল পরের নিন্দে রটিয়ে বেড়ায়। সে যে কী কান্ড! আরেকটু হলেই মারামারি লেগে যেত।'

'মাগো! দ্যাখো কান্ড! কী করে গড়াল বলুন তো?'

এরকম খেলায় কী পাবে শিশু, কী তার সমৃদ্ধি লাভ হবে। এ খেলায় মূল্যবান সারবস্তু কিছু নেই, কোনো উদ্যোগের প্রয়োজন হয় না। নেলী আর বান্ধবী মানিয়া দিনের পর দিন কেবল ফ্ল্যাট-বাড়ির পড়শীদের আলাপ নকল করে চলে।

উল্টোদিকে আশেপাশের জীবনে কী ঘটছে সে দিকে বরিয়ার এতটুকু আগ্রহ নেই। তার একমাত্র নেশা খেলনা মোটর-গাড়ি। সে গাড়ির কলকব্জা না ভাঙা পর্যন্ত সে তা নিয়ে সারাদিন খেলতে রাজী। প্রথমে বাপ-মায়ে ভেবেছিল ছেলেটি ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়র হবে। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল

গাড়ির কলকব্জা নিয়ে তার একেবারেই মাথাব্যথা নেই। একটা গাড়ি নষ্ট হলেই দাবি করে আরেকটা কিনে দাও। এ রকম খেলায় না দরকার উদ্যোগ, না শ্রমপ্রয়োগ না উদ্ভাবনশীলতা। অনুরূপ খেলা বিশ্লেষণ করে আ. মাকারেঙ্কো সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন, 'যে খেলায় আত্মপ্রচেষ্টা লাগে না, সক্রিয় কর্মতৎপরতা দরকার হয় না — সেটা খারাপ খেলা।' উপরের দৃষ্টান্তটি একেবারে তাই।

খেলাধুলা পরিচালনার অর্থ — সর্বাগ্রে খেলার মধ্যে এমন সারবস্তুর ব্যবস্থা রাখা, যাতে শিশুর সঠিক লালন, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণের বিকাশ সহজ হয়।

খেলার সময়ে শিশুদের সঠিক সংগঠনের তাৎপর্যও কম নয়। ছেলেরা যাতে সমঝোতা করে মিলেমিশে খেলে, নিজের অংশটুকু সততার সঙ্গে পালন করে এটা দেখা বিশেষ জরুরী।

একবার নিচের দৃশ্যটি দেখতে হয়েছিল আমাদের। সীমান্ত প্রহরীর খেলা খেলছিল শিশুরা। ছয় বছরের কোলিয়া ছিল 'ডিউটি'তে। এমন সময় বাজার করে ফিরলেন মা।

'বল তো দেখি তোদের জন্যে কী কিনেছি।'

সবাই হুটোপুটি করে জুটল মায়ের বাজার দেখতে, কিন্তু কোলিয়া অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যদিও মা যে খেলনা এনেছে তা দেখবার জন্যে তার ঔৎসুক্য কম ছিল না।

'কোলিয়া, খেলনা দেখতে আসছিস না যে বড়ো? কী কিনেছি দেখবার শখ নেই বুঝি?' জিজ্ঞেস করেন মা।

'আমি এখন যেতে পারব না। সীমান্ত পাহারা দিচ্ছি,' দৃঢ়ভাবে জানালে কোলিয়া।

ছেলের ধৈর্য ও কর্তব্যবোধটা মা ভালোই বুঝেছিলেন। কিন্তু তার ওপর যাতে মাত্রা ছাড়িয়ে চাপ না পড়ে সে জন্য অন্য ছেলেটির দিকে চেয়ে বললেন:

'কমরেড কম্যান্ডার, অনেক সময় হল, এবার পাহারা বদলাবার পালা। কে যাবে?'

মনোহর খেলনা ফেলে বোনটি ছুটে গিয়ে তার জায়গা নিলে।

তবে ছেলেমেয়েদের খেলার প্রতি মায়েরা সব সময় এমন সতর্ক নজর

দেন না। খেলার একটা স্বাভাবিক পরিণতি টানা ও তার মাধ্যমে ক্রীড়ার ভূমিকাজাত উন্নত মনোভাবটাকে গভীর করে তোলার বদলে মা প্রায়ই কড়া সুরে খেলা থামিয়ে সমস্ত অনুভূতিটাকে গুঁড়িয়ে দেন, 'ন্যাকামি ছেড়ে যা বলছি কর!'

মাঝে মাঝে খেলার গতি ফেরানো দরকার হয় সত্যি, কিন্তু সেটা কর্তব্য কেবল সেই ক্ষেত্রে যেখানে খেলার মূলকথাটা নেতিবাচক, যেমন যখন তাতে মায়ের প্রতি বাপের অভদ্র আচরণ, বা মা-বাপ, দাদা দিদিমার প্রতি ছেলেমেয়ের রূঢ়তার অনুকরণ ঘটে।

ছেলেমেয়েদের খেলা দেখে মা-বাপ তাদের অনেক ভালো করে চিনতে পারে, কেননা খেলার মধ্যেই তাদের মনোভাব ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। ছেলেমেয়েদের খেলা পর্যবেক্ষণ করে মা-বাপে জানতে পারে শিশুর মনোযোগ ক্ষমতা কতটা দৃঢ়: একটা জিনিস শুরু করে সেটা সে শেষ পর্যন্ত চালায় নাকি মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে অন্য আরেকটার পেছনে লাগে; মুশকিল দেখলে সে কি উদ্ভাবনশীলতা, উদ্যোগ ও দৃঢ়তা দেখায় নাকি চট করে পিছিয়ে আসে; নিজের খেলনাপাতির যত্ন নেয় কি, তা টিকিয়ে রাখে কি? ইত্যাদি। এসব জানা মা-বাপের পক্ষে অতি জরুরী, তাহলেই সময় থাকতে শিশুর ত্রুটি দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

শিক্ষামূলক খেলার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। এগুলি হল খেলার মধ্যে দিয়ে জ্ঞান বা শিক্ষাদানের কোনো একটা লক্ষ্য সিদ্ধ করা। এসব খেলা সাধারণত বড়োরাই বেছে দেন এমন ভাবে যাতে তার নিয়ম নির্দিষ্ট বয়সের পক্ষে সহজ ও বোধগম্য হয়, যাতে শিশুর আগ্রহ থাকবে ও তার শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। যেমন অল্প বয়সের শিশুদের জন্যে দেওয়া হয় নানা রঙের ব্লক, মিনার, খুলে বার করে ফের বন্ধ করার মতো পুতুলের মধ্যে পুতুল, লুডো, রঙীন বাসন কোসন ইত্যাদি। এতে শিশুরা বিভিন্ন জিনিসের রঙ, আকৃতি ও আয়তন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। খেলতে খেলতে আশেপাশের জিনিসপত্র সম্বন্ধে তাদের ধারণা পাকা হয়, ধীরে ধীরে তারা জিনিস দেখেই চিনতে পারে, তুলনা করতে পারে, বাছাই করতে পারে একই ধরনের জিনিস। এর ফলে আবার তাদের বোধ, মনোযোগ, স্মৃতি, চিন্তা ও বাক্য বিকশিত হয়।

আমিও সেলাই করতে পারি

পাঁচ সাত বছরের শিশুদের জন্য দেওয়া হয় জটিলতর খেলনা। যেমন উদ্ভিদ ও বিভিন্ন জীববিষয়ক লুডো, যাতে শিশুর দিগন্ত প্রসারিত হয় ও বিভিন্ন বস্তুর শ্রেণীবিভাগ করতে সে শেখে। টেবিলে বসে গণনার নানা খেলনাও বিশেষ প্রয়োজন।

সোভিয়েত শিক্ষণবিদেরা তিন চার ও পাঁচ ছয় বয়স্ক শিশুদের সকলের সর্বাঙ্গীন মানসিক বিকাশের জন্য শিক্ষাপ্রদ খেলার একটা পুরো পদ্ধতি গড়ে তুলেছেন।

যে বয়সের যেমন বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা সেই অনুসারে **খেলনা** বাছতে হয়। যেমন বাচ্চাদের পক্ষে 'মা' 'মেয়ে' ইত্যাদি পুতুল, সংসার যাত্রার নানা জিনিস, বাসনপত্র, আসবাবপাতি, ঠেলাগাড়ি ইত্যাদি দেওয়া যায়। পুতুলকে ধুয়ে মুছে খাওয়ানো, শোয়ানো, ঠেলাগাড়িতে চাপানো, পোষাক পরানো, খোলানো — এই একই কাজ বার বার করেও তাদের একঘেয়ে লাগে না। পুতুল নিয়ে

খেলতে খেলতেই শিশুরা তাদের প্রাথমিক সভ্য রীতিনীতি, স্বাস্থ্যবিধি আর শ্রমাভ্যাস পাকা করে নেয়।

এর চেয়ে বড়ো শিশুদের আগ্রহ অন্যবিধ: যেমন উৎসবে আসা নানা জাতের শিশু, নানা পেশার লোক। পুতুল নিয়ে খেলাটাও তাদের এখন অনেক জটিল: তাদের পুতুলেরা এখন সফর করে বেড়ায়, ডাক্তারখানায় যায়, স্কুলে বসে, কারখানায় কাজ করে। লক্ষণীয় যে এর মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকাটা কিন্তু শিশু নিজের জন্যে রাখে। শিশুই ডাক্তার হয়ে হার্ট পরীক্ষা করে পুতুলের, থার্মোমিটার লাগায়, ওষুধ দেয়, ব্যাণ্ডেজ বাঁধে। সেই শিক্ষয়িত্রী হয়ে বেঞ্চিতে বসায় পুতুলদের, পড়ায়, হোম টাস্ক দেয়। এক্ষেত্রে শিশুর প্রয়োজনীয় মালমসলা সরবরাহ করা খুবই সহজ: একটুকরো ব্যাণ্ডেজ, ওষুধের শিশি, পুতুলের স্কুলের জন্যে একসারসাইজ বুক। দরকার হলে পরামর্শ দেওয়া যায় কী ভাবে চিমনিওয়ালা জাহাজ বানাতে হয়, খেলনা পতাকা, খেলনা টেলিফোন ইত্যাদি দেওয়া যায়।

শিশুরা কিছু একটা বানাতে খুবই ভালোবাসে, কিন্তু **নির্মাণের মালমশলা** দেওয়া উচিত সহজ ও সাধাসিধে: কাঠের ব্লক, ছোট্ট তক্তা, রঙীন কাপড়ের টুকরো।

আরেকটু বড়োদের মন **যন্ত্রের** দিকে, তাদের দরকার লোহার ও কাঠের মেকানো এবং জটিলতর নির্মাণ-উপকরণ, কলকব্জার খেলনা, যাতে তারা সেতু, সাঁকো, উঁচু বাড়ি, ট্রেন ইত্যাদি বানাতে পারে।

সব শিশুই জীবজন্তু ভালোবাসে, কিন্তু খেলে তারা নানানভাবে: কাঠের একটা ঘোড়া পেলে বাচ্চারা সানন্দে তার গলায় দড়ি বেঁধে টেনে বেড়াবে, কিন্তু আরেকটু বড়ো বয়সের শিশুদের তাতে মন উঠবে না; তারা চায় চিড়িয়াখানা, যৌথখামার ইত্যাদি জটিলতর খেলায় মাততে। তাই তাদের জন্যে অন্য বৈচিত্র্যের পশুদল প্রয়োজন।

ঘরে বানানো খেলনা শিশুদের খুবই প্রিয় হয়, যদি তার প্রস্তুতিতে অংশ নেয় তারা। কাঠের টুকরো, কাগজ, দেশালাই, বাক্স ইত্যাদির সঙ্গে অন্যান্য মালমশলা জুড়ে নানা ধরনের খেলনা বানানো সম্ভব। তা বানানোয় দাদাদিদিরা অনেক সাহায্য করতে পারে।

বালি নিয়ে খেলতে ভারি ভালোবাসে শিশুরা। তা দিয়ে তারা বাড়ি,

বাগান, স্টেশন ইত্যাদি গড়ে। এর সঙ্গে যদি বালির ছাঁচ, গাছের ডাল, পশুপাখি ঘরবাড়ির কাঠের মূর্তি ইত্যাদি জোগানো হয় তবে শিশুদের সৃজনীশক্তির সম্ভাবনা বাড়ে।

কিছু একটা নিজের হাতে করতে, সৃষ্টি করতে খুবই ভালোবাসে শিশু, জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে খানিকটা যে বিশৃঙ্খলা এতে সম্ভব, তাতে ভয় না পেয়ে শিশুর এ সৃষ্টি প্রবণতা সমর্থন করা উচিত। এগুলো তারা নিজেরাই যাতে পরিষ্কার করে সেটা তাদের শেখানো দরকার, কিন্তু কিছু একটা মাথা খাটিয়ে বার করা, গড়ে তোলার এ উদ্যোগ তাদের মূল্যবান গুণ হিসাবে সর্বতোভাবে বাঁচিয়ে রাখা চাই।

শিশুদের খেলার মতো পরিস্থিতি গড়ে দেওয়া মা-বাপের পক্ষে খুব জরুরী। এমন একটা নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ করা দরকার যেখানে শিশু নিজেকে কর্তা বলে ভাবতে পারে, যেখানে তার খেলনাপাতি ও প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা থাকবে। অনেক খেলনা দেবার দরকার নেই, তবে এমন ভাবে তা বাছাই করা উচিত যাতে শিশুর সক্রিয়তা ও উদ্যোগ বাড়ে, যাতে শিশুর পক্ষে ভেবে বার করা, নির্মাণ করা, জুড়ে তোলা সম্ভব হয়।

খেলা — এ হল শিশুর সক্রিয়তার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক রূপ, এ নিয়ে বহু বই লেখা হয়েছে, বহু গবেষণা চলেছে। শিশু লালনের পক্ষে তার বৃহৎ তাৎপর্য দেখে বহু বাপ-মা ভেবে বসেন স্কুলে ঢোকার আগে সেইটাই বুঝি শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের একমাত্র পদ্ধতি। শিশুটি যদি বেশ ভালোরকম অনেকক্ষণ ধরে খেলে, তবে যেন তার সঠিকভাবে মানুষ হয়ে ওঠায় আর সন্দেহ রইল না। এ দৃষ্টিভঙ্গির গলদ শিশুটি স্কুলে ঢোকা মাত্র পরিষ্কার হয়ে ওঠে। শিশুটি হয়ত সত্যিই ভারি উদ্যোগী, হুঁশিয়ার, তৎপর, যা বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু সে জোর করে মনোযোগ অর্পণ করতে পারে না, শিক্ষক যা বলছেন তাতে মন বসাতে পারে না, যেটা তার নিজের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছে থেকে, তার খেলার আগ্রহ থেকে আসছে না, তা নিয়ে কাজ করতে সে অক্ষম। যে সব শিশু পরিবারের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলার, মন বসানোর, সংসারের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন পড়লে খেলা ফেলে আসতে পারার শিক্ষা পায়নি, সে শিশুর শৃঙ্খলাবোধ সাধারণত কম, সেই কারণেই নিয়মিত বিদ্যাভ্যাস তার পক্ষে কঠিন।

খেলার তাৎপর্য বিপুল, কিন্তু তাই বলে সেইটাই শিক্ষাদানের সার্বজনীন পদ্ধতি হতে পারে না। অনধিক সাত বছর বয়সের শিশুদের মানুষ করে তোলার জন্য শিক্ষাদানের বিচিত্র রূপ ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

এরা শুধুই খেলে তা নয়। পড়াশুনা করতেও ভালোবাসে তারা। সঠিক পরিচালনায় শিশুরা পড়াশুনা করলে স্কুলে ঢোকার পক্ষে তাতে ভালো প্রস্তুতির কাজ হয়।

সোভিয়েত কিণ্ডারগার্টেনগুলিতে একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচি মেনে শিশুদের পড়াশুনা চালানো হয়। শরীরচর্চা, মাতৃভাষা, পরিবেশ পরিচয়, গণনা, অঙ্কন, সঙ্গীত, মডেলিং, নকসা তোলা, নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন বয়সের শিশুরা কী কী শিখবে তার একটা ছক স্থির করা হয়েছে।

শিশু যদি কিণ্ডারগার্টেনে না থাকে তাহলে প্রতিদিন সকালে শিশু যাতে অঙ্কন, মডেলিং, নির্মাণ, সেলাই ইত্যাদি কোনো একটা বিষয় নিয়ে খানিকটা বসতে শেখে সেটা দেখা মা-বাপের দরকার।

শিশুটি যাতে লেগে থাকতে শেখে, বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে পারে, শুরু করে শেষ পর্যন্ত চালায়, বড়োদের দেওয়া কাজ পালন করে, পরিবেশের জ্ঞানকে আরো নিখুঁত ও প্রসারিত করে তোলে, সেটা একটু একটু করে শেখানো বড়োদের অবশ্য কর্তব্য।

এমন কি ছয় সাত বছরের শিশুদের মধ্যেও মনঃসংযোগের ক্ষমতা তেমন বিকশিত হয় না: সহজেই তার মন বিক্ষিপ্ত হয় এবং নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে তার মন যদি নিয়মিতভাবে টেনে আনা না হয় তাহলে অন্যমনস্কতা তার অভ্যাস হয়ে যাবে, কাজ শুরু করে শেষ পর্যন্ত তা চালিয়ে যেতে পারবে না।

অথচ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে তিন চার বছরের শিশুদের মধ্যেও একটু একটু করে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে মনোযোগ চালিত করা যায় এবং সেই সঙ্গে তার মধ্যে কতকগুলি প্রাথমিক অভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভব। একটা দৃষ্টান্ত দিই। লেনা প্রায়ই দেখে তার মা রঙীন ডায়াগ্রাম কাগজে সাঁটছে। তারও ইচ্ছে হয় মা যেমন করছে তাই করবে। তার অনুরোধে মা তাকে দিলেন আটা, বুরুশ, কাগজ আর রঙীন নানা ছক। মেয়েটি কিছু না ভেবে চটপট গোটা কাগজটায় আটা মাখিয়ে তার ওপর কয়েকটা রঙীন ছক চাপিয়ে থাবড়া

মারলে। তারপর নোংরা, বিদঘুটে জিনিসটার দিকে হতাশ হয়ে চেয়ে আটা মাখা হাতে সখেদে জানাল 'উঁহুঃ, হচ্ছে না… আর করব না।'

খুবই পরিষ্কার যে তার হতাশার কারণ হল তার প্রাথমিক অভ্যাসের অভাব, যার ফলে নিজের কল্পনাটা রূপায়িত করে কাজটা শেষ পর্যন্ত চালানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

জনকজননী সম্মেলনে লেনার মা বলেন, 'একদিন আমি কিন্ডারগার্টেনে গিয়ে লক্ষ্য করি শিশুরা কী ভাবে রঙীন কাগজ সাঁটছে। দেখেই পরিষ্কার বুঝলাম, লেনাকে কী ভাবে সাহায্য করতে হবে। বিভিন্ন আয়তনের চৌকোনা কয়েকটা কাগজ কেটে আমি লেনাকে বললাম, "এবার মিশা ইশকুলে যেভাবে করে সেই ভাবে কর। সোজা হয়ে বস, টেবিলের ওপর হাতদুটো আর টুলের ওপর পা। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, এবার মন দিয়ে শোন, মিশা যেমন শোনে ইশকুলে।" আমার এই প্রস্তাবনা মেয়ের খুব ভালো লাগল। তার দাদা মিশা। এই বছরেই স্কুলে প্রথম ঢুকেছে। তা নিয়ে তার গর্বের সীমা নেই। লেনা তাকে অনুকরণ করতে চায়, প্রায়ই ইশকুল ইশকুল খেলে। চটপট সে ঠিক হয়ে বসল "মিশার মতো"। "এবার আমার দিকে মন দিয়ে চেয়ে দ্যাখ, যা বলছি শোন। এই হল শাদা কাগজ, তার ওপর এই কালো মার্জিন। এই মার্জিন বরাবর চৌকোগুলো বসিয়ে যা। প্রথমে সবচেয়ে ছোটো তারপর ক্রমশ বড়ো। দ্যাখ কেমন চমৎকার সিঁড়ি হয়ে গেল। সাঁটবি এই লাইন বরাবর সমান করে, আটা লাগাবি কেবল টুকরোগুলোয়। সেঁটে দেবার পর ন্যাতা দিয়ে এইভাবে মুছে দিবি।" কী ভাবে সন্তর্পণে আটা লাগাতে হয়, কোথায় এবং কী ভাবে তা সাঁটতে হবে, ন্যাতা দিয়ে কী ভাবে মুছতে হবে তা দেখিয়ে দিই। প্রথমটা তার খুব ভালো না উৎরোলেও মেয়েটা বেশ মন দিয়েই সেঁটে গেল। ফল দেখেও খুশি হল সে। "হয়েছে! হয়েছে! ঠিক মায়ের মতো!" খুশি হয়ে চেঁচালে মেয়েটা।

'চৌকোগুলো যে ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠেছে সেই দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, "তোরটা দেখি আমার চেয়েও ভালো উৎরেছে। এই দ্যাখ, আমার চৌকোগুলো কী রকম অসমান, আর তোরগুলো কেমন ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠেছে।" এই প্রশংসায় লেনার আনন্দ আর ধরে না। মন দিয়ে সে আমার কাগজটা আর তার নিজের কাগজটা দেখে চৌকোগুলোর দিকে

আঙুল দিয়ে বার কয়েক পুনরাবৃত্তি করলে: "প্রথমে সবচেয়ে ছোটো, তারপর আর একটু বড়ো, তারপর আর একটু বড়ো, আরো বড়ো।"'

এইভাবে কাগজ সাঁটার প্রথম অভ্যাস এবং ছোটো বড়োর জ্ঞান অর্জন করেছিল লেনা।

'পরের দিন সে নিজে থেকেই বললে, "এসো মা, ইশকুল ইশকুল খেলি।"'

পেত্রভা বলেছেন, 'লক্ষ্য করলাম, লেনার হাবভাব এই সব সময়ে আগের থেকে একেবারে বদলে যেত। একেবারে টানটান হয়ে বসত সে, চেষ্টা করত "স্কুলে যেমন বসে" সেইভাবে বসবে, মুখের ভাবটি বেশ ভারিক্কী, মনোযোগী। আমার দেওয়া কাজটা সে মন দিয়ে শুনত, যেমনটি বলেছি সেইভাবে তা করার চেষ্টা করত। আমার সময় যেত ১০-১৫ মিনিট, কিন্তু ফল হল ভালো। "কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষকদের গাইডবইখানা" কয়েকদিনের জন্যে চেয়ে আনতে হল কিণ্ডারগার্টেন থেকে; মন দিয়ে দেখলাম কী কী বিষয় কী পরিমাণে তিন চার বছরের শিশুদের পড়ানো হয়। আমি নিজে শিক্ষণবিদ নই। তাহলেও ব্যাপারটা বোঝা গেল, লেনার জন্যে প্রয়োজনীয় ও সাধ্যায়ত্ত বিষয় বাছতে খুবই সাহায্য হয়েছিল তাতে।'

এই ভাবের চর্চায় তাৎপর্য কতটা? লেনার মা সে কথা খানিকটা বলেছেন। নির্দিষ্ট কাজটা পালনের জন্য দরকার হত মায়ের নির্দেশটা মন দিয়ে শোনা, উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজে লাগা, নিখুঁতভাবে তা পালন করার চেষ্টা করা। বড়োদের কাছে শেখার সময় যে অভ্যাস গড়ে ওঠে সেটা শিশুরা প্রায়ই তাদের খেলাধুলায় এবং নিজের পছন্দমতো কোনো একটা চর্চায় সফলভাবে কাজে লাগায়।

দৃষ্টান্তটা থেকে আমরা এ কথা বলতে চাই না যে শিশুর সবকিছু চর্চাই বড়োদের নির্দেশ মতো চলবে। নিজের পছন্দমতো বিষয়ের চর্চা শিশুরা নিশ্চয় করতে পারে, কিন্তু বাপ-মায়ের পরিচালনায় তারা যে জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ও অভ্যাস আয়ত্ত করে তাতে তাদের কর্মতৎপরতা অনেক সংগঠিত, লক্ষ্যানুগামী ও বহুমুখী হয়ে ওঠে।

অন্য একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। শিশুরা অল্প বয়স থেকেই আঁকতে অথবা মানুষের মডেল গড়তে চায়। মা বলেছেন, 'আমার পাঁচ বছরের মেয়েটির আঁকা দৈবাৎ নজরে পড়ে। দেখি যে সে মানুষের মূর্তি আঁকতে

প্ল্যাস্টিকসের মডেল গড়ি

হলে সর্বদাই করে কি, প্রথমে একটা গোল রেখা টানে, সেই হল মাথা। তা থেকে সরাসরি নিচে নামিয়ে আনে দুটো সোজা রেখা, এই হল দেহকান্ড। আর এই দুই লম্ব রেখার ঠিক মাঝখান থেকে বেরয় দুই হাত। বললাম, "আমার দিকে ভালো করে দেখ। এই আমার মাথা" (হাত দিয়ে মাথা দেখালাম), "মাথা থেকে গলা নেমেছে, গলার দুপাশে কাঁধ, কাঁধ থেকে হাত নেমেছে নিচের দিকে।" নিজের প্রতিমূর্তিই যেন আঁকছি এই ভাবে আমার প্রতিটি অঙ্গ হাত দিয়ে ওকে চিনিয়ে দিলাম। মন দিয়ে দেখলে মেয়ে। পরে ও যে মনুষ্য মূর্তি আঁকল সেটা নিখুঁত না হলেও গলা কাঁধ তার বাদ পড়েনি, হাত দুটিও ছিল যথাস্থানে। এই ঘটনার পর রায়া কী আঁকে এবং কেমন করে আঁকে তার দিকে মন দিলাম। আমি নিজে আঁকতে পারি না, আঁকার বিদ্যে ওকে পুরো শেখাবার চেষ্টা করিনি। তবে ওর পর্যবেক্ষণ শক্তি এগিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম।'

সঠিক পরিচালনা থাকলে আঁকার মধ্য দিয়ে স্কুলের জন্য হস্তলিপির ভালোরকম তালিম পেতে পারে শিশু। তার জন্য শিশু পেনসিল রঙ

পাওয়ার প্রথম দিন থেকেই তা ব্যবহারের সঠিক শিক্ষা দেওয়া উচিত। যেমন, শিশু যাতে বুড়ো আঙুল ও মধ্যমার মাঝে পেনসিল ধরে তর্জনীটি তার ওপর আলগোছে রাখে, সেটা দেখা জরুরী। শুরু থেকে সে যাতে সঠিকভাবে চেয়ারে বসে টেবিলে কনুই পেতে রাখে, কাগজপত্তরের ওপর ঝুঁকে না থাকে সেটা দেখা দরকার। শিশুর বয়সের উপযোগী টেবিল না থাকলে পায়ের নিচে একটা নিচু টুল দিয়ে চেয়ারের ওপর পুরু কুশন পেতে, কিংবা তক্তা পেতে বসার মতো যুৎসই ব্যবস্থা করে নেওয়া যেতে পারে। কনুই থেকে হাতটুকু যেন স্বচ্ছন্দে টেবিলে রাখা যায়, পা ভর দেওয়া যায় টুলের ওপর। চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে আনাই ভালো। সর্বদা মনে রাখা দরকার যে শিশুর মেরুদণ্ড অতি নমনীয় এবং বেঠিক ভঙ্গির বারবার পুনরাবৃত্তি হলে তা বিকৃত হতে পারে (কুঁজো, বাঁকা শিরদাঁড়া, ইত্যাদি)।

মা-বাপ বা বড়ো ভাইবোনে সরাসরি ছেলেদের বই পড়ে শোনায়, কাহিনী বলে, কবিতা বা গান শেখায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও শিশুদের কাছ থেকে কতকগুলি দাবি করা প্রয়োজন।

যে কথাটা বলা হল তার প্রতি একটা সশ্রদ্ধ মনোভাব ছোটো থেকেই গড়ে তোলা উচিত, শিশু যেন মন দিয়ে শুনতে শেখে, অন্যমনস্ক না হয়। তিন চার বছর বয়সেই শিশুর পক্ষে ছোট্ট একটা কাহিনী কি কবিতা ধৈর্য ধরে পুরো শুনে যাওয়া সম্ভব, পাঁচ-সাত বছর বয়সে আরো দীর্ঘ মনঃসংযোগ দাবি করা উচিত।

শিশুর কথা ফোটার একটা মূল উৎস হল বড়োদের সঠিক উচ্চারিত ভাষা। কিন্তু পরের কথা শুনলেই হয় না, সক্রিয়ভাবে তার অনুশীলন করা উচিত। এরূপ অনুশীলনের পক্ষে গল্প শুনে ফের বলা, সহজসাধ্য কবিতা আবৃত্তি করা, ছবি দেখে ব্যাখ্যা করা, মজার কথা, জিভ জড়ানো ছড়া ইত্যাদি খুব কাজ দেয়। শিশু পুস্তক, ছবি দেখে কাহিনী বলা ইত্যাদি যেমন কথার সঞ্চয় ও দৃষ্টিপরিধি প্রসারের পক্ষে তেমনি নৈতিক ধারণা ও সৌন্দর্যবোধ বৃদ্ধির পক্ষেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে যেটা পড়ে শোনানো বা গল্প করা হচ্ছে তার বিষয়বস্তু বাছাই হল এক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরী। এগুলি হওয়া উচিত শিল্পগুণান্বিত, শিশুর শিক্ষার দাবি যেন তাতে মেটে, এবং তা হওয়া চাই শিশুর বয়সোচিত বৈশিষ্ট্য ও আগ্রহ অনুযায়ী। যেমন, তিন চার বছরের

শিশুদের প্রথম বই হওয়া উচিত ছবির বই। সাধারণত প্রতিটি ছবির সঙ্গেই থাকে ছোট্ট একটু পাঠ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ছড়া। এই ছড়াটা শিশু ক্রমশ মুখস্থ করে নেয় এবং নিজেই বইয়ের পাতা উলটিয়ে ছড়া 'পড়তে' থাকে।

ছড়া বা লেখা ছাড়াও সুন্দর ছবি দেখে শিশুর ধারণাশক্তির বৃদ্ধি ও কথার বিকাশ ঘটে। যেমন, প্লাস্তভের 'গৃহপালিত পশু' নামক শিশু-অ্যালবামটা তাদের সামনে খুলে ধরে বড়োরা তাদের জীবজন্তুর জ্ঞান আরো পাকা করে তুলতে, প্রতিটি পশুর নাম মনে রাখতে সাহায্য করতে পারে।

তবে বই দিয়ে শিশুদের ভারাক্রান্ত করা অনাবশ্যক। নতুন বই কেবল তখনই দেওয়া ভালো, যখন পুরনো বইখানা পুরোপুরি আয়ত্ত হয়েছে, নইলে শিশুদের মনঃসংযোগ ক্ষমতার বিক্ষিপ্ত অভ্যাস হয়ে যাবে, আগ্রহ হবে ভাসাভাসা: একটু উল্টেপাল্টে দেখেই বলবে নতুন বই চাই।

রূপকথা খুব ভালোবাসে শিশু, বিশেষ করে লোকপ্রচলিত রূপকথা। বিভিন্ন বিদেশী রূপকথাও সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুবাদ করে বহুল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অ্যান্ডারসন, পেরুরো, গ্রীম ভ্রাতাদের লেখার বহু সংস্করণ এদেশে প্রকাশিত হয়েছে। 'কোঠাবাসী', 'তিন ভালুক', 'ছাগল আর নেকড়ে', 'শেয়াল শশক আর মোরগ' ইত্যাদি জীবজন্তুর কাহিনী শিশুদের অতি প্রিয়। এ তারা দিনের পর দিন শুনে যেতে রাজী। কাহিনীগুলির ছন্দ আর শব্দপুনরাবৃত্তি এই বয়সের শিশুদের বৈশিষ্ট্যোপযোগী, সহজে মনে রাখায় সাহায্য হয় তাতে।

এই সব কাহিনী নিয়ে অভিনয় করতে ভালোবাসে অনেকে। দুটি মেয়েকে দেখেছি আমরা, প্রতিদিন বারকয়েক করে তারা 'কোঠাবাসী' খেলা খেলত। একজন টেবিলের নিচে বসে নানা গলায় 'কোঠার' সবকটি জন্তুর অভিনয় করত, 'আমি কুটুর কুটুর নেংটি ইঁদুর', 'আমি ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ কোলা ব্যাঙ'। অন্য মেয়েটি হত নবাগত অতিথি। কখন কে আসছে সেই অনুসারে গলার সুর বদল করে সে বলত, 'ঠুক, ঠুক, কার বাস কোঠায়, কার বাস ডেরায় ?' তারপর 'কোঠা' থেকে জবাব পাওয়ার পর মিহি বা মোটা গলায় জানাত কে টোকা দিচ্ছে দরজায়।

শিশুর মানসিক বিকাশের পক্ষে এই ধরনের নাট্যরূপ বেশ উপকারী।

কিন্তু ডাইনী-পেত্নী, আগ্নমুখো অজগর, রাক্ষসখোক্ষস ইত্যাদির ভয়াবহ গল্প অনুচিত, অল্পবয়সের শিশুদের পক্ষে তা ক্ষতিকর।

তিন বছরের লিউদাকে সাহসী নির্ভীক করে তুলতে চায় তার মা-বাপ। সব সময় তার হাত ধরে পার করা হয় না তাকে, নিজে নিজে খানা পেরতে বা ঢালু বেয়ে নামতে দেওয়া হয়, পড়ে গেলে আহা উহু করা হয় না। গরু বা কুকুরের কাছে যেতে ভয় পায় না মেয়েটি, রাতে শোবার সময় তাকে নিশ্চিন্তে একলা অন্ধকারে রেখে দেওয়া হয়। লিউদা যেন জানেই না ভয় কাকে বলে, কিন্তু একদিন তার সামনে করা হল আগুনমুখো আটমুণ্ড নাগের গল্প, প্রতি রাতে যে একটি করে মেয়ে হরণ করত। সন্ধ্যায় শোবার সময় সে কিছুতেই একা থাকতে চাইল না, বহুক্ষণ ঘুম হল না তার। রাতে ডুকরে কেঁদে জেগে জেগে উঠল, 'আমায় খেয়ে ফেলবে, আমায় আর কেউ দেখতে পাবে না।' সাহস জাগাবার পক্ষে এরূপ প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহেই খারাপ, শিশুর স্নায়ুতন্ত্রের উপর তার ক্রিয়া অতি ক্ষতিকর।

একদিন সন্ধ্যায় শহরের উপকণ্ঠে আট বছরের নাদিয়ার সঙ্গে যাচ্ছিলাম, বেশ বুদ্ধিমতী, শান্তশিষ্ট মেয়ে। বনের মধ্যে ঢুকতেই সে সজোরে আমার হাত চেপে ধরল, কিছুতেই ছাড়তে চাইল না।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল তোর, ভয় পেলি নাকি?'

'না ভয় করছে না, তবে কেবলি মনে হচ্ছে ডালে ছোট্ট একটা ডাইনী বসে আছে, আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

'ডাইনী বিশ্বাস করিস নাকি তুই?'

'না বিশ্বাস করি না,' দৃঢ়ভাবেই বললে নাদিয়া। তারপর খানিকটা চুপ করে থেকে জানাল, 'যখন খুব ছোটো ছিলাম, তখন অনেক ডাইনীর গল্প শুনেছি। এখন বিশ্বাস করি না, তাহলেও অন্ধকারে একা থাকলেই মনে হয় ঐ বুঝি ডাইনী।'

শিশুকে কী দিচ্ছি, তার বয়সে কোনটা উচিত, এটা না ভাবার এই হল ফল। অথচ যে সব রূপকথায় আটমুণ্ড নাগ, ডাইনী ইত্যাদি আছে, সেগুলোর অধিকাংশই শিশুকে ভয় দেখাবার জন্য নয়, বরং যারা ভয় জয় করে দৃঢ় সংকল্পে লক্ষ্য সিদ্ধ করছে, তাদের সাহস ও পৌরুষের জয়গান করার জন্য। কিন্তু অল্প বয়সের শিশুরা সেটা তখনো ধরতে পারে না,

কাহিনীর ছবিটা তাদের ওপর প্রত্যক্ষ ছাপ ফেলে। তাই এ থেকে শিশুর সাহস না জেগে ভয়ই জাগে।

ছয় সাত বছরের শিশুদের ধারণার পরিধি ও পরিমাণ অনেক প্রসারিত। তিন চার বছরের শিশুদের যেক্ষেত্রে শুধু তার কাছে অতি ঘনিষ্ঠ বিষয়েরই গল্প করা যায় যা তারা সরাসরি দেখছে বা ধরতে পারছে, সে ক্ষেত্রে ছয় সাত বছরের শিশুদের কাছে এমন বিষয়ের কথাও বলা যায় যা তারা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেনি। যেমন অন্য দেশের শিশুদের জীবন, সামাজিক জীবনের ঘটনাবলী, বিভিন্ন ধরনের পেশার কাহিনী।

লেনিনের কাহিনী এই বয়সের শিশুরা খুব ভালোবাসে: যেমন আ. কোনোনভের লেখা 'সকোলনিকিতে নববর্ষ', আ. ই. উলিয়ানভার লেখা 'লেনিনের শৈশব ও স্কুলজীবন' থেকে নানা গল্প, ন. ক. ক্রুপস্কায়ার 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন' ইত্যাদি।

এই বয়সের শিশুরা প্রায় প্রত্যেকেই জানে মায়াকভস্কির রচনা 'কী

মন দিয়ে কাজ

হবো?', 'কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ'। দৈনন্দিন মেহনতের বীরত্ব কাহিনীও খুব মন টানে ছেলেদের, যেমন মার্শাকের লেখা 'অজ্ঞাত বীরের কাহিনী', 'ডাক' ইত্যাদি।

ছয় সাত বছর বয়সের শিশুরা হাস্য রসের বই বুঝতে পারে, যেমন মার্শাকের লেখা 'দ্যাখো কেমন আনমনা', মিখাল্‌কভের 'স্তেপা খুড়ো' ইত্যাদি।

চিরায়ত সাহিত্যের অনেকটাও তাদের বোধগম্য যেমন, আ. স. পুশকিনের 'জেলে আর মাছের কাহিনী', ল. ন. তলস্তয়ের 'আঁটি' ইত্যাদি গল্প, ক. দ. উশিনস্কির 'জামার গাছ', 'ভোরের কিরণ', ন. আ. নেক্রাসভের 'মাজাই দাদু আর খরগোস'।

তিন চার বছরের শিশুরা যেখানে তিন চার লাইনের ছড়া মুখস্থ করতে পারে, সে ক্ষেত্রে বড়োদের ক্ষমতা অনেক বেশি। শিশুদের জন্য এই ধরনের কবিতা সংকলনের বই প্রকাশ হয় অনেক।

পরিবেশের জীবন ও প্রকৃতি বিষয়ে শিশুদের পর্যবেক্ষণ চালিত করার দিকে বিশেষ মন দেওয়া দরকার। পরিবেশের জীবন সম্পর্কে শিশুদের পরিচয় ঘটিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্রের নাম ধাম শিখিয়ে, তাদের তাৎপর্য কী তা বুঝিয়ে দিয়ে বড়োরা তাদের মনের দিগন্ত বাড়িয়ে তুলতে ও তাদের ভাষা ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। তাই সংসারের কাজ করতে করতে মা তার ঘরোয়া জিনিসগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে তিন চার বছরের শিশুর, দেখাতে পারে কী ভাবে রান্না করা হয়।

'এই হল সব শব্জী — আলু, গাজর, পেঁয়াজ। ছুরি দিয়ে খোসা ছাড়ালাম, জল দিয়ে ভালো করে ধুলাম। এই বার টুকরো করে কোটা। দে আমায় দুটো গাজর। দেখ কেমন চমৎকার গোল গোল করে কাটলাম। চেখে দেখবি নাকি, গাজরের স্বাদ কেমন? এই বার আমায় দে তো দুটো আলু, ফের দুটো আলু, ফের দুটো আলু। বাস। আলু কুটব কিন্তু চৌকো চৌকো করে, দেখবি কী সুন্দর।'

পাঁচ সাত বছরের শিশুদের বেশি আগ্রহ কলকব্জার দিকে।

মা বলতে পারেন, 'চল যাই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে দুজনে মিলে ঘর পরিষ্কার করি।' প্রথমে ঝাড়ব গালিচা। গালিচার বুরুশটা নিয়ে আয়, এবার বুরুশটা ফিট করা যাক। এবার ক্লিনারের হাতলটা ধরে গালিচার ওপর

টেনে টেনে নিয়ে যা এই ভাবে। তাড়াতাড়ি নয়, কোনো জায়গা যাতে ফাঁক না যায়।'

সংসারে ঘড়ি, রেডিও, টেলিফোন ইত্যাদি যা থাকে তারও সদ্ব্যবহার করা উচিত। ছয় বছরের শিশুকে ঘড়ি দেখা বেশ শেখানো যায়। প্রথমে ঘড়ির ঘণ্টা। ঐ দেখ এক দুই করে সাতবার বাজল, তার মানে এখন ঘুম থেকে উঠতে হয়। তারপরে শেখাতে হয় সংখ্যা চিহ্ন। ছোটো কাঁটাটা ৯এর ঘরে এসেছে। এবার শুতে হয়।

ছয় সাত বছর থেকেই টেলিফোনের সঠিক ব্যবহার, যেমন রিঙ বাজলে নিজে উত্তর দেওয়া বা বড়োদের ডেকে দেওয়া ইত্যাদি শেখানো যায়।

রোজ বাইরে বেড়ায় শিশুরা। চারপাশের জীবনটা জটিল ও বিচিত্র। তাই বড়োদের ভূমিকা এক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক: পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় শুরু করতে হয় সবচেয়ে নিকটতম বস্তুগুলি দিয়ে। যেমন যেটায় বাস করে সেই বাড়িটা। তার মোট কত তলা, কোন তলায় থাকে শিশুটি নিজে, বাড়ির নম্বর কত, যে রাস্তায় বাড়িটা সে রাস্তার নাম কী, পাড়ায় কী কী ভবন আছে, যথা পোস্ট আপিস, কিন্ডারগার্টেন, স্কুল, রুটির দোকান, জুতো মেরামতির কারখানা ইত্যাদি। শিশুদের বিশেষ নজর থাকে যন্ত্রের দিকে যেমন মোটরগাড়ি, বাস, মাটির নিচের মেট্রো রেলপথ, মাল তোলার ক্রেন ইত্যাদি, গ্রামাঞ্চলে ট্র্যাক্টর, কম্বাইন প্রভৃতি। শিশুর জানার আগ্রহ মেটানো খুব জরুরী, যন্ত্র নিয়ে তার এই কৌতূহলে উৎসাহ দেওয়া উচিত যেমন যন্ত্র ব্যবস্থাটা দেখা, ড্রাইভারের কাজটা লক্ষ্য করা, যা দেখা হল তা নিয়ে আলাপ করা; উপযুক্ত বই পড়ে শোনানো, ছবি দেখানো।

মানসিক বিকাশের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল শিশুদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ।

শিশুর পক্ষে প্রকৃতি হল এক আশ্চর্যের রাজ্য।

লিউবার যখন দুই বছর, তখনই সে প্রতিটি কীট, ব্যাঙ, ফুল দেখেই দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করত, 'কী এটা?'

তিন বছর বয়সে তার আগ্রহ শুধু 'কী' নয় 'কেন'। পরিবেশ সম্পর্কে জানতে চাওয়া প্রতিটি শিশুরই বৈশিষ্ট্য, তার এই স্বাভাবিক আগ্রহ চাপা দেওয়া নয়, বরং তার কৌতূহলকে পরিচালিত করা, তার পর্যবেক্ষণকে

নিখুঁত করা, তার সাধ্যায়ত্ত জ্ঞান যাতে সে সক্রিয়ভাবেই অর্জন করতে পারে তার সুযোগ করে দেওয়া মা-বাপের অথবা বয়স্ক অভিভাবকদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। লিউবার মায়ের ডাইরি থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি:

'আজ সন্ধ্যায় লিউবা বাবার সঙ্গে মাঠে বেড়াতে যায়। হাতে ব্যাগের মধ্যে রুটি, একটুকরো মাংস আর পাখিদের জন্যে কিছু দানা নিয়ে যায় তারা। গরু দেখে বাপ বললে, "লিউবা, গরুটার জন্যে ভালো দেখে খানিকটা ঘাস ছিঁড়ে আন তো।" মেয়ে সাগ্রহেই ঘাস ছিঁড়ে গরুর দিকে হাত এগিয়ে দিল। "খাচ্ছে, খাচ্ছে। এবার রুটি দেব। রুটিও খেল। এবার মাংস দিই। উঁহু মাংস খাচ্ছে না যে!" মুখ ভার হল মেয়ের। এমন সময় ছুটে এল একটা কুকুর, "নে, মাংস খা!" গরু যেটা খেল না সেটা সাগ্রহেই খেলে কুকুরে। "এবার নে ঘাস খা!" কুকুর বিরক্ত হয়েই মুখ ফেরাল। লিউবা একটা পরিপূর্ণ সঠিক সিদ্ধান্ত টানল "কুকুরে ঘাস খায় না।"'

ঘরোয়া বাগানে বড়োদের কাজকর্ম লক্ষ্য করে এবং সাধ্যমতো তাতে অংশ নিয়ে অনেক প্রত্যক্ষ ও অর্জনযোগ্য জ্ঞান লাভ করে শিশুরা। লিউবার মা লিখেছেন, 'লিউবা আজ বেরি ফলের ঝোঁপগুলো থেকে অনিষ্টকারী কীট খুঁজে বার করতে খুব সাহায্য করেছে। কেবলি বলছিল, "আরে সব অনিষ্টকারী কীট! লজ্জাও নেই! দাদু কত খেটে চলেছে, আর তোরা কেবলি নষ্ট করছিস।" দিনটা ছিল ভারি গরম। সন্ধের দিকে ফুলগুলো নেতিয়ে পড়ল। সে দিকে প্রথম নজর করলে লিউবা, দাদুর সঙ্গে এর আগেই সে বেশ কয়েকবার ফুলগাছে জল দিয়েছে। বললে, "দ্যাখো, ফুলগুলোর মাথা নেতিয়ে পড়েছে। তেষ্টা পেয়েছে, দাঁড়া, দাঁড়া, জল দিচ্ছি এখুনি।"'

নিজের পর্যবেক্ষণ, বড়োদের সঙ্গে আলাপ এবং সক্রিয়ভাবে প্রকৃতির কাজে অংশ গ্রহণ মারফৎ লিউবার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে কীট উদ্ভিদকে নষ্ট করে, তাই অনিষ্টকারী কীটের ধ্বংস করা দরকার, গাছের জন্যে জল দরকার, জল ছাড়া গাছ মরে যায়। প্রকৃতির নিয়মশাসিত ঘটনাবলী সম্পর্কে এই যে তার জ্ঞান, এ জ্ঞানটা প্রত্যক্ষ, সক্রিয়ভাবে অর্জিত এবং আবেগের মধ্য দিয়ে অনুভূত।

ঠিক এই পথেই পরিবেশের সঙ্গে যে পরিচয় সেটা হল শিশুর মানসিক বিকাশের ভিত্তিস্বরূপ, তার বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির প্রথম ধাপ।

লালনের একটা মূল লক্ষ্য হল **শিশুর মনের দিগন্ত প্রসারিত করা,** কিন্তু তার সার্থকতার জন্য শিশুর বয়সোচিত সম্ভাবনার সঠিক পরিমাপ প্রয়োজন।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে পরিবারের মধ্যে শিশু লালনে দুই ধরনের চূড়ান্তপণা ঘটে।

এক ধরনের মা-বাপ পরিবেশ পরিচয়ের ব্যাপারে শিশুকে নিজের মতো ছেড়ে দেয়, ভাবে তার মনের দিগন্ত প্রসারিত করাটা স্কুলের কাজ; অন্যেরা আবার বাছবিচার না করে জ্ঞান দিয়ে শিশুকে ভারাক্রান্ত করতে উদগ্রীব, ছবি ছাড়া, ছবি ভরা যত রাজ্যের বই কিনে দিয়ে, নিয়ে যায় আজ এ প্রদর্শনী, কাল ও সিনেমায়, জোর করে তার মানসিক বিকাশ ঘটাতে চায়। এই দুই পথই ভ্রান্ত।

কিছুদিন আগে চার বছরের একটি মেয়েকে দেখেছিলাম। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে থাকতে পারত না মেয়েটি, না থেমে অনর্গল বকবক করে চলেছে।

তার দিকে অত্যধিক মন দেয় মা-বাপে। বাড়িতে টেলিভিজন আছে, হরেক রকমের বই আছে মেয়েটির, বড়োরা তাকে শেখাতে চায় যত পারে ছড়া। অথচ মেয়েটির বিকাশ থেমেই থাকছে। মেয়েটির উচ্চারণ সঠিক হলেও তার ভাষা অসংলগ্ন, ভাবনা অস্পষ্ট, পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা ঝাপসা। নিজেদের বাগানেরই গাছপালার নাম সে জানে না, যে মাঠে এই মাত্র বেড়িয়ে এল সেখানে কী ফুল ফুটেছে, যে গরুটাকে সে দেখল সেটা কী ভাবে ডাকে, কুকুরের কয়টা পা, খাবার সময় যে বাসনপত্তর দেওয়া হয় সেগুলোকে কী বলে এ সব সে বলতে পারে না। সংক্ষেপে, তার বয়সে যা খুবই উচিত, চারপাশের জিনিসপত্র, ঘটনাবলী সম্পর্কে তেমন পরিষ্কার ধারণা তার নেই। সবচেয়ে প্রধান কথাই উপেক্ষা করেছেন তার মা-বাপ: দেখা দরকার শিশু শুধু উচ্চারণ করলেই হল না, তার মানে কী সেটাও বুঝতে পারছে।

চারিপাশের জিনিসপত্র ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার সময় তাদের নাম এবং অর্থ কী তাও জানিয়ে দেওয়া দরকার। এই কথাসর্বস্ব মেয়েটির মা-বাপে যা করেছেন সেভাবে ভাষাকে পরিবেশ পর্যবেক্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা উচিত নয়। যান্ত্রিকভাবে শব্দ উচ্চারণ করে যাওয়ার অর্থ মোটেই ভাষা আয়ত্ত করা নয়।

তিন চার বছরের শিশুর যে চিন্তা সেটা চিত্রময় ও প্রত্যক্ষ। এই বয়সের শিশুদের কথা সাধারণত তাদের সংসারে, কিণ্ডারগার্টেনে ও নিকট পরিবেশে দেখা জিনিসপত্র ও ঘটনাবলীর বাইরে যায় না। এই বয়সের শিশুরা পোষা পশু পাখি পর্যবেক্ষণ করতে, তাদের গলার স্বর নকল করতে খুব ভালোবাসে।

যেটা সে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করেনি, অন্তত ছবিতেও যা দেখেনি, সেটা সে কল্পনা করতে পারে না।

এর উল্টো একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে একজন যৌথ কৃষাণী মাকে বেড়াতে দেখেছিলাম আমরা।

আশেপাশের জিনিস সম্পর্কে মেয়ের কৌতূহল বুঝে মা বেড়াতে বেড়াতে প্রায়ই থামছেন। তাঁর সতর্ক দৃষ্টি থেকে কিছুই এড়িয়ে যাবার উপায় নেই, খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই তিনি মেয়ের কৌতূহল চালিত করছিলেন, 'কী এটা?' 'এটা পাখি, চড়ুই মণি, চড়ুই। দেখ কেমন ঠোকরাচ্ছে। ওই দ্যাখ, একটা দানা খুঁজে বার করেছে, সাবাস! দেখেছিস কেমন চটপট, সেয়ানা, দানা লুকিয়ে থাকার জো নেই। আর ঐ দ্যাখ, ফুল। ছুটে গিয়ে তুলে আন দেখি, শাদা 'রামাশকা' ফুল, মাথায় মুকুট গেঁথে দেব। এবার কিছু হলদে ফুল দ্যাখ তো, খাসা দেখাবে। চোখ বুঁজে বল তো দেখি কোনটা শাদা, কোনটা হলদে। (হাত দিয়ে বড়ো বড়ো শাদা ফুলগুলো ছুঁয়ে দেখল মেয়েটি, ছোটো ছোটো হলদেগুলোকে শুঁকে দেখল।) এই তো দিব্যি, আমাদের কাতিয়া চোখ বুঁজেও বলে দিতে পারে।'

পরিবেশ পরিচয়ে এই মা যে ভাবে চলেছেন সেটা মোটেই জটিল কিছু নয়, তিন বছরের শিশুর যা আগ্রহ ও বোধগম্য তা পুরো বোঝা হয়েছে। তা থেকে শিশুর মানসিক বিকাশের ফলও হয়েছে ভালো। চারপাশের জিনিসপত্র ও প্রকৃতির সরল ধরনের ঘটনাবলী সম্পর্কে মেয়েটির জ্ঞান পরিষ্কার। তিন বছরের শিশুর পক্ষে যতটা সম্ভব সে ধরনের শব্দ ভাণ্ডার তার যথেষ্ট, কথার সংলগ্নতা সকলের কাছেই পরিষ্কার। মেয়েটির জানার আগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ শক্তি আছে বেশ।

শিশুলালনের সমস্ত ক্ষেত্রের মতো, শিশুদের শিক্ষা দেবার ব্যাপারেও একটা নির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অবশ্যই প্রয়োজন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মা-বাপেদের জন্য বিশেষ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়, যেমন রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের শিক্ষাদপ্তরের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষণবিদ্যার প্রকাশভবন থেকে প্রকাশিত 'লালন পালন বিষয়ে জনকজননীর প্রতি,' রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শিক্ষণবিদ্যা আকাদমি প্রকাশিত 'মা-বাপের প্রতি উপদেশ' তথা লালনের প্রশ্নে অন্যান্য নানা সন্দর্ভগ্রন্থ।

'কিণ্ডারগার্টেন গাইড' গ্রন্থের পদ্ধতি বিষয়ক দলিলের সঙ্গে পরিচয় রেখে ও কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেও মা-বাপে শিশু লালনের ব্যাপারে যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

দেখা যাচ্ছে শিশুর লালনে মা-বাপের ভূমিকা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। এই বয়সেই ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের বনিয়াদ গাড়া হয়, স্কুলের জন্য সুসঙ্গতভাবে তৈরি করে তোলা হয় শিশুকে।

একেবারে ছোটো থেকেই শিশু মানুষ করে তোলার ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরী, তার ফলে পরে নতুন করে মানুষ করে তোলার প্রশ্ন উঠবে না। কেননা নতুন করে মানুষ করে তুলতে হলে অনেক জটিল ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন, সে পথ অনেক কঠিন ও কষ্টকর।

মা-বাপেদের সাবধান করে আ. মাকারেঙ্কো সত্য কথাই বলেছেন, 'শিশুকে সঠিক ও স্বাভাবিকভাবে মানুষ করে তোলা — এটা তাকে নতুন করে মানুষ করে তোলার চাইতে অনেক সহজ। একেবারে শৈশব থেকেই সঠিক শিক্ষাদান এটা অনেকে যা ভাবেন মোটেই তেমন দুরূহ নয়... যে কোনো ব্যক্তিই নিজের শিশুটিকে ভালো করে মানুষ করে তুলতে সহজেই পারেন যদি তিনি তা সত্যই চান, তাছাড়া এ দায়িত্বটা প্রীতিকর, সুখকর, আনন্দময়। নতুন করে মানুষ করে তোলা — সেটা একেবারেই অন্য ব্যাপার... পুনর্শিক্ষায় দরকার হয় অনেক বেশি সামর্থ্য, অনেক বেশি জ্ঞান, অনেক ধৈর্য, যা সব মা-বাপের থাকে না।'

শিশু লালনের কর্তব্য কিন্ডারগার্টেন পালন করতে পারে কেবল পরিবারের সঙ্গে এক যোগে কাজ করে।

'কিন্ডারগার্টেনে
শিক্ষাদানের কর্মসূচি' থেকে

সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিবার ও কিন্ডারগার্টেন

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশু মানুষ করে তোলা কেবল পরিবারের নিজস্ব ব্যাপার নয়। সোভিয়েত রাষ্ট্র এটাকে দেখে মাতৃভূমির প্রতি মা-বাপের সম্মানীয় কর্তব্য হিসাবে এবং শিশু লালনে সর্ববিধ সাহায্য দেয় পরিবারকে।

শিশুর জন্মের আগে থেকেই তার প্রতি রাষ্ট্রের যত্ন শুরু হয়। সোভিয়েত আইনে মাতা ও শিশু সযত্নে রক্ষণীয়। গর্ভধারণ ও প্রসবের সময় কর্মরতা মায়েরা ১১২ দিন পর্যন্ত বেতন সহ ছুটি পান, প্রসব জটিল হলে অথবা জমজ সন্তান হলে তা দাঁড়ায় ১২৬ দিন, প্রসবের পর আরো দু সপ্তাহ বেশি ছুটি পান তাঁরা। অন্তঃসত্ত্বা ও স্তন্যদায়ী মেয়েদের জন্য বিশেষ শ্রম সংরক্ষণ দাবি করা হয় সোভিয়েত আইনে, দরকার হলে সমান মাইনেতে তাদের সহজতর কাজে বদলি করা হয়। স্তন্যদায়ী মায়েরা প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর আধঘণ্টা করে অতিরিক্ত ছুটি পান। সন্তান জন্মের পর মা যদি অনধিক এক বৎসর কাজ না করেন তাহলেও তাঁর কর্ম রেকর্ড অবিচ্ছিন্ন বলে ধরা হয় — এটা পরে তাঁর পেনশন প্রাপ্তি, সামাজিক বীমার দিক থেকে জরুরী।

শিশু চিকিৎসা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা শিশুর সঠিক বাড় ও বিকাশের ওপর নজর রাখে। প্রসূতি সদন থেকে ঘরে ফেরার প্রথম দিনেই মা-র কাছে এসে হাজির হন ডাক্তার বা নার্স, শিশু পরিচর্চার বিশদ পরামর্শ দেন তাঁরা। শিশু পরামর্শ কেন্দ্রের মূল কাজ হল রোগ নিরোধ। আগে থেকেই

বসন্ত, ক্ষয়রোগ, পলিওমিয়েলিটিস, ডিপথিরিয়া ইত্যাদি রোগের টীকা দেওয়া হয় শিশুদের, শিশুর স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে মা-বাপদের উপদেশ দেওয়া হয়। এই সব কেন্দ্রের অধীনে পথ্য বিপণি আছে, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মতো সেখান থেকে শিশুর প্রয়োজনীয় পথ্য সরবরাহ করা হয়।

শিশুর দেখা শোনা ও চিকিৎসা, বাপ-মাকে পরামর্শ, প্রসব ইত্যাদি সবই সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত মেডিকেল সেবা ব্যবস্থার মতোই বিনামূল্য।

নারীদের মাতৃত্বের সঙ্গে দেশের উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপ ও সামাজিক জীবন মেলাবার সমস্ত সুযোগ দেয় সোভিয়েত সরকার। সোভিয়েত সংবিধানে পুরুষের সঙ্গে নারীর অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে পূর্ণ সমাধিকার বর্তমান এবং সে অধিকার ভোগের গ্যারান্টি মেলে মাতা ও শিশুর স্বার্থের রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণ থেকে, কিন্ডারগার্টেন ও শিশু লালনাগারের এক জাল বিস্তার করে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বছরে বছরে বাড়ছে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই কর্তব্য নিয়েছে যে, বাপ-মায়ে চাইলে যেন সমস্ত শিশুর জন্যই এরূপ ব্যবস্থা থাকে। ১৯৬৩ সাল নাগাদ এ দেশে ছিল ৪১,৭১,৭০০টি শয্যা সমেত প্রায় ৫৩ হাজার কিন্ডারগার্টেন। ১৩,৭১,৮০০ শিশু থাকে লালনাগার-গুলিতে। তাছাড়া, গ্রীষ্মকালের মরশুমী বাগানবাড়ি ও শিশু প্রাঙ্গণে ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ শিশু। ১৯৬৫ সাল নাগাদ কিন্ডারগার্টেনের শয্যাসংখ্যা বেড়ে উঠবে ৪২,০০,০০০টিতে। শিশু কিন্ডারগার্টেনের জন্য বিশেষ ডিজাইনের চমৎকার চমৎকার ভবন নির্মিত হচ্ছে, শিশুর সুস্থ জীবন ও তার সর্বাঙ্গীন লালনের মতো সমস্ত যুক্তিসম্মত ব্যবস্থা তাতে থাকছে।

সোভিয়েত নারীরা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন, কেননা তাঁরা জানেন যে শিশু প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাদের শিশু আছে অভিজ্ঞ লালনবিদ, শিক্ষক ও পাশ করা চিকিৎসা কর্মীদের তত্ত্বাবধানে। সামাজিক জীবনে মা যে অংশ নেন তাতে শিশুর সঠিক লালনে বিঘ্ন তো হয়ই না, বরং সাহায্য হয়। বলাই বাহুল্য পরিবারে শিশু পালনের দায়িত্ব তো একা মায়ের নয়, বাপেরও সমান দায়িত্ব। মাতৃভূমির প্রতি এটা তার সম্মানীয় নাগরিক কর্তব্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কয়েক ধরনের শিশু প্রতিষ্ঠান আছে। প্রধান ধরনটা হল দীর্ঘ সময় যাপনের মতো (১০-১২ ঘণ্টা) কিন্ডারগার্টেন, বাপ-

মায়ে যা কাজ করে সময়টা তার চেয়ে অনেক বেশি। দিবারাত্রির কিণ্ডারগার্টেনও খুব প্রচলিত, এখানে গোটা কর্মসপ্তাহ ধরে শিশুরা থাকে, বাড়ি আসে কেবল রবিবার ও ছুটির দিনে। এই ছাড়া আছে স্যানাটোরিয়াম ধরনের বোর্ডিং কিণ্ডারগার্টেন — দৈহিকভাবে দুর্বল শিশুদের যত্ন নেয় তা; শহরের বাইরেকার স্যানাটোরিয়াম, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য মাস কয়েকের মেয়াদে শিশুদের পাঠানো হয় সেখানে। মূকবধির শিশুদের জন্য আছে বিশেষ কিণ্ডারগার্টেন, বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে।

কিণ্ডারগার্টেন ও লালনাগারগুলির মধ্যে আরো উত্তম পূর্বানুবৃত্তি ও বাপ-মায়ের সুবিধার জন্য হালে লালনাগার ও কিণ্ডারগার্টেন মিলিয়ে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়া হচ্ছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ ভবনের ব্যবস্থা হয় যাতে শিশু থেকে সাত বছর পর্যন্ত বালকদের মানুষ করে তোলার বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর থাকে। এখানে কাজ চলে যে কর্মসূচি অনুসারে সেটা রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শিক্ষণবিদ্যা আকাদমি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা আকাদমি বিশেষভাবে রচনা করেছেন।

কিণ্ডারগার্টেন সংগঠন করা হয় জনশিক্ষা দপ্তর ও বৃহৎ উদ্যোগগুলির পক্ষ থেকে। বড়ো বড়ো কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে একাধিক করে এই ধরনের শিশু প্রতিষ্ঠান আছে।

যৌথখামারগুলিতে সামাজিকভাবে শিশু পালনের ব্যবস্থা থাকায় যৌথ কৃষাণীরা উৎপাদনে ও সামাজিক জীবনে সক্রিয় অংশীদার হতে পারেন। এখন প্রতিটি যৌথখামারই নিজেদের একটি সুসজ্জিত কিণ্ডারগার্টেন চালাতে সচেষ্ট। বহু যৌথখামারে আর একটি কিণ্ডারগার্টেনে চলছে না। যেমন স্ভের্দলভস্ক এলাকার 'দৃঢ় যোদ্ধা' যৌথখামারের আছে পাঁচটি কিণ্ডারগার্টেন, গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় তা অবস্থিত, ফলে শিশুদের পেণছে দেওয়ার খুব সুবিধা। কিণ্ডারগার্টেনগুলি গ্রীষ্মকালে চলে ১০/১২ ঘণ্টা, শীতকালে ৯ ঘণ্টা।

কিণ্ডারগার্টেনগুলি শিশু ও কর্মরতা মায়েদের চাহিদার পক্ষে যে কী উপযোগী তা বোঝা যাবে কেবল এই সব প্রতিষ্ঠানের বৈচিত্র্য থেকে নয়, তাদের লালন ও শিক্ষামূলক কাজের সমগ্র ব্যবস্থাপনা থেকেও।

ইজেভ্স্ক শহরে যন্ত্র-নির্মাণ কারখানার ৭ নং কিণ্ডারগার্টেন

ইজেভ্স্ক শহরে যন্ত্র-নির্মাণ কারখানার ৭ নং কিণ্ডারগার্টেন

কিন্ডারগার্টেনগুলির কাজের ভিত্তিতে আছে বিজ্ঞানসম্মত সুপ্রতিষ্ঠিত একটা রুটিন। তিন বার করে খাবার পায় শিশুরা, যারা রাতে থাকে তাদের জন্য চার দফা আহার। খাবার তৈরি হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমির পুষ্টি ইনস্টিটিউটে রচিত বিশেষ ফর্দ অনুযায়ী। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই ঘুমাবার ব্যবস্থা খোলা হাওয়ায়, উন্মুক্ত বারান্দায়। সর্বাঙ্গীন দৈহিক বিকাশের জন্য বিশেষ ব্যায়াম ও ছুটোছুটি খেলার ব্যবস্থা থাকে।

কিন্ডারগার্টেনগুলির সঙ্গে থাকে গাছপালার একটা এলাকা, অত্যন্ত ঠান্ডা ও বৃষ্টির দিন ছাড়া শিশুরা এখানে রোজ ঘণ্টা পাঁচেক করে কাটায়। শিশুর স্বাস্থ্য ও তার দেহকে পোক্ত করে তোলার পক্ষে অন্যতম ব্যবস্থা এটি।

গ্রীষ্মকালে নগরের শিশু প্রতিষ্ঠানগুলি শহরের বাইরে চলে যায়, সেখানে শিশুদের গোটা দিনই কাটে যথাসম্ভব খোলা হাওয়ায়। ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে শিশুদের বায়ুস্নান, রৌদ্রস্নান ও জলস্নানের ব্যবস্থা হয়।

কিন্ডারগার্টেনে সাধারণত চারটি গ্রুপ থাকে: ছোটোদের গ্রুপ (তিন বছর), মাঝারিদের গ্রুপ (৪ বছর) বড়োদের গ্রুপ (৫ বছর) এবং প্রাক স্কুল গ্রুপ (৬ বছর)। সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরো থাকে লালন গ্রুপ। এই শিশু গ্রুপগুলির শিক্ষকেরা সাধারণত তাদের কিন্ডারগার্টেনে আসা থেকে স্কুলে ঢোকা পর্যন্ত গোটা সময়টা ধরে একই গ্রুপ নিয়ে কাজ করেন। এর ফলে প্রতিটি শিশুকে ভালো করে জানা, এবং ঘরে সে কী ধরনের শিক্ষা পাচ্ছে তা হিসাবে নিয়ে এক একজনের প্রতি এক একটা ব্যক্তিগত ধারা অবলম্বন করা সম্ভব হয়। মানুষ করে তোলার পক্ষে এতে সর্বাধিক সাফল্য নিশ্চিত হয়।

প্রতিটি গ্রুপের জন্য শিক্ষকেরা এক একটা বিশেষ কর্মসূচি অনুসারে চলেন, নির্দিষ্ট বয়সের শিশুটি কী কী অভ্যাস, জ্ঞান ও আচার ব্যবহার অর্জন করতে পারে তা দেওয়া থাকে তাতে।

সোভিয়েত কিন্ডারগার্টেনগুলির বৈশিষ্ট্য হল এ কর্মসূচি সফল করার জন্য শিক্ষকদের দৈনন্দিন প্রচেষ্টা। খেলাধূলা, চর্চা ও জীবনযাত্রায় শিশুদের উদ্যোগ ও তৎপরতায় উৎসাহ দিয়ে শিক্ষকেরা তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও শিক্ষার চাহিদা অনুসারে সে তৎপরতাকে সুসঙ্গতভাবে চালিত করেন।

কিন্ডারগার্টেনগুলিতে অনেক মন দেওয়া হয় শিশু যৌথ গঠনের দিকে। কিন্ডারগার্টেনে শিশু ভর্তি হবার প্রথম দিন থেকেই তার যৌথবোধ,

মিলেমিশে খেলার অভ্যাস, চর্চা, স্বেচ্ছায় খেলনার ভাগ দেওয়া, পরস্পরকে সাহায্য করা, যৌথে গৃহীত নিয়ম মেনে চলা ও সরল ধরনের শ্রম দায়িত্ব পালনের শিক্ষা শুরু হয়। ছোটোদের দেওয়া হয় খুবই ছোটোখাটো কাজ: টেবিলে চামচ রাখা, সঙ্গীর পোষাকের বোতাম আঁটা। বড়োদের কাজ আর একটু শক্ত। শিশুরা ক্রমে ক্রমে স্বাবলম্বনের শিক্ষা পায়। নিজে নিজেই পোষাক পরে, হাত মুখ ধোয়। খাবার পরিবেশনে সাহায্য করে, গাছপালা পশুপাখির পরিচর্যা করে, নিজের খেলাধুলা ও পড়াশুনার জায়গাটি পরিষ্কার রাখে। শিশুদের মেহনত পরিচালনায় সবচেয়ে জরুরী হল তাদের মধ্যে শ্রমের প্রতি একটা আবেগরঞ্জিত ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা।

বড়োদের শ্রমের প্রতি যত্নশীল হবার শিক্ষা দেওয়া হয় শিশুদের — যেমন হাত মুখ ধোবার সময় মেজের ওপর যেন জল না ছিটায়, টেবিল ক্লথ নোংরা না করে ইত্যাদি। যৌথের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের প্রতিও একটা সযত্ন আচরণ ধীরে ধীরে গড়ে তোলা হয় তাদের মধ্যে।

মস্কো অঞ্চলের মিতিশ্চি শহরে
কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের খেলার ঘর

দিনে দিনে শিশু শেখে তার কিণ্ডারগার্টেনটিকে ভালোবাসতে। জায়গাটা যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর দেখায়, কিণ্ডারগার্টেনের সব শিশুরই যাতে ভালো হয় তার জন্যে যত্ন নিতে শুরু করে। ছোটোদের যত্ন নিতে শেখে বড়োরা। ধীরে ধীরে কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতিবোধ গড়ে তোলা হয় তাদের মধ্যে, বুঝতে শেখে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, যা করা অনুচিত তা থেকে বিরত থাকতে শেখে। নিজের শহরটি, নিজের যৌথখামারটি ভালোবাসতে শেখে শিশু, চারিপাশের লোকজনের পরিশ্রমের প্রতি তার আগ্রহ জাগানো হয়, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের অভ্যাস গড়ে ওঠে।

নিকটতমের প্রতি, আত্মীয়ের প্রতি, প্রত্যক্ষের প্রতি ভালোবাসা থেকে বেড়ে ওঠে জন্মভূমির প্রতি গভীরতর প্রেম। বড়ো শিশুদের পরিচয় ঘটানো হয় বিভিন্ন জাতির মেহনত ও শিল্পের সঙ্গে, অন্য দেশের লোকেদের প্রতি তার আগ্রহ ও ভালোবাসা জাগিয়ে তোলা হয়।

শিশুদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও পরিবেশ পরিচয় এমন ভাবে চালিত করার চেষ্টা করেন শিক্ষকেরা যাতে তাদের মনোযোগ, পর্যবেক্ষণশক্তি, লক্ষ্যাভিমুখীনতা, সঙ্গীদের কাজের সঙ্গে নিজের কাজের সমন্বয় করার সামর্থ্য ও অন্যান্য নৈতিক গুণ ও মানসিক শক্তি জেগে ওঠে।

কিণ্ডারগার্টেনে অনেক সময় দেওয়া হয় খেলায়, অভিনয়মূলক, নির্মাণমূলক, শিক্ষামূলক ও ছুটোছুটির খেলায়। প্রতিটি গ্রুপের জন্য বিশেষ এক একটা খেলার ঘর, বা জায়গা, সেখানে থাকে সেই বয়সের শিশুদের যত খেলার সামগ্রী, খেলার ঘরবাড়ি বানাবার মালমশলা।

শিশুদের খেলার ওপর নজর রাখে শিক্ষিকারা, তাকে চালায় এমন ভাবে যাতে শিশুদের পরস্পর বন্ধুত্ব, শৃঙ্খলাগুণ, উদ্ভাবনশীলতা, অধ্যবসায়, ও মনের দিগন্ত প্রসারে সাহায্য হয়। খেলার সময় অন্য সঙ্গীদের স্বার্থের কথা মনে রাখার শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের।

শিশুদের সর্বাঙ্গীন লালন ও স্কুলের জন্যে তাদের তৈরি করার পক্ষে সরাসরি পাঠের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃ ভাষার শিক্ষা দেওয়া হয় শিশুদের (উচ্চারণ, কথন), পরিপার্শ্বের ঘটনাবলী আর প্রকৃতির জ্ঞান দেওয়া হয়, গণনা করতে শেখে। অনেক কিণ্ডারগার্টেনে বিদেশী ভাষাও শেখে শিশুরা, যেমন ইংরেজি, ফরাসী বা অন্য কোনো ভাষা। শরীর ও শিল্প চর্চায় অনেক

'দাঁড়া তোকে সাজিয়ে দিই!'
(যৌথখামারের একটি কিন্ডারগার্টেন)

সময় দেওয়া হয়। নিয়মিত চলে দেহচর্চা (দৌড়, হাঁটা, ভারসাম্য রক্ষার ব্যায়াম, লাফ, ছোঁড়া, কিছু বেয়ে ওঠা, বিভিন্ন পেশীর বিকাশের জন্য ব্যায়াম ইত্যাদি) এবং সঙ্গীতচর্চা (গান, সঙ্গীত শ্রবণ, তালে তালে গতি, নাচ, গানের খেলা)। আঁকতে, মডেল গড়তে, উজ্জ্বল করে কাহিনী বলতে ও কবিতা আবৃত্তি করতেও শেখে শিশুরা।

শিশুর বয়স ও পাঠের বিষয় অনুসারে শিক্ষাদানের রূপ, পদ্ধতি ও প্রণালী হয় বিভিন্ন রকমের। যেমন শিক্ষকের আলাপ ও ব্যাখ্যা, নমুনা করে দেখান, পর্যবেক্ষণ, শিক্ষামূলক খেলা ইত্যাদি।

রুটিনে পাঠের জন্য সময় খুব অল্প (ছোটোদের গ্রুপে ১০ মিনিট, আর প্রাক স্কুলের ছয় বছর বয়সের শিশুদের জন্যে দিনে দুবার অল্প একটু করে ক্লাস), তাহলেও অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, শিশুদের মানসিক শক্তি ও তাদের আগ্রহবৃদ্ধির পক্ষে এই পাঠের প্রভাব খুব বেশি। পাঠের বিষয়টা থেকে প্রায়ই তাদের খেলাধুলা, কথাবার্তা ও আচরণের গতি স্থির হয়ে যায়। তাদের দৈনন্দিন জীবন দেখেও আবার শিক্ষিকাকে বুঝতে হয় কী হবে

পাঠের বিষয়বস্তু। শিশুর জ্ঞান বা নৈপুণ্যে কোনো ফাঁক পড়লে সেটা পরের পাঠে পূরণ করার চেষ্টা হয়।

শিশুদের জীবনে সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হল তাদের শিশু উৎসব — যা তাদের আবেগে ও আনন্দে জ্বলজ্বল করে ওঠে। জাতীয় উৎসবগুলি ছাড়াও 'পাখির দিন', 'ফসলের দিন', শিশুর জন্মদিন ইত্যাদি পালিত হয়। উৎসবের জন্য তৈরি হতে থাকে শিশুরা, কবিতা মুখস্থ করে, নাচ গান শেখে, মা-বাপ বা সঙ্গীসাথীদের জন্য উপহার বানায়। পেশাদার শিল্পীদের গান, অভিনয়, পুতুল নাচ, ছায়া নাটক, সিনেমা, এবং রঙীন স্লাইড ইত্যাদি দেখানো হয় কিণ্ডারগার্টেনে।

কিণ্ডারগার্টেনে যে শিশুরা থাকে তাদের মা-বাপেরা সাধারণত শিক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন। কিণ্ডারগার্টেনের একটা মূলনীতি হল শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের কর্তব্য পালনে কিণ্ডারগার্টেন ও পরিবারের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা। **কিণ্ডারগার্টেন শিশু মানুষ করে তোলে পরিবারের সঙ্গে যোগ রেখে, তার সাহায্যে।**

শিশু লালনে সুন্দর মিলমিশ পরিবারের ভূমিকা সর্বদাই বিপুল, বিশেষ করে ছেলেবেলায়। প্রতি পরিবারেই আছে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিজ নিজ কৃতিত্ব ও প্রচেষ্টা। তাদের মধ্যে যা কিছু শ্রেয় তা ছেলের মধ্যে পেঁছে দেওয়া হল মা-বাপের দায়িত্ব, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ প্রক্রিয়ায় যে নূতন নৈতিক গুণ তারা অর্জন করেছে সেটা সন্তানের মধ্যে জাগিয়ে তোলা তাদের কর্তব্য। অনেক মা-বাপই আ. মাকারেঙ্কোর এই উপদেশ মেনে চলেন, 'দেশে যা কিছু নিষ্পন্ন হচ্ছে সেটা আপনাদের আবেগ, আপনাদের মন বেয়ে পেঁছন চাই আপনাদের সন্তানদের কাছে। আপনার কারখানায় যা ঘটছে, যেটায় আপনার আনন্দ অথবা আপনার খেদ সেটাতে আগ্রহ থাকা উচিত আপনার সন্তানের।' পরিবারের মধ্যে শিশু পালনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় মা-বাপ যে কাজ করেন, সামাজিক জীবনে তাঁরা যে অংশ নেন সেটা শিশুর সঠিক লালনে বাধা তো হয়ই না বরং সাহায্য করে, সে লালনের অন্তর্বস্তু আরো সমৃদ্ধ হয়।

অনধিক সাত বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর কাছ থেকে যা যা দাবি করা হচ্ছে তার ঐক্য ও সুসঙ্গত রূপায়ণ বিশেষ জরুরী। শিশুর প্রতি আচরণে বড়োদের

মধ্যে পার্থক্য ঘটলে লালন কার্যে বিঘ্ন হবে। কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষকেরা মা-বাপকে জানান তার শিশু যে গ্রুপে পড়ে তার জন্য কী কী লালন-শিক্ষামূলক কর্তব্য রাখা হয়েছে, এবং কিণ্ডারগার্টেনের কর্মসূচি পরিবারের মধ্যে সফলভাবে চালিয়ে যেতে হলে শিশুটির জন্য ব্যক্তিগতভাবে আর কী কী করা প্রয়োজন। শিশু প্রতিষ্ঠান আবার তার দিক থেকে পরিবারটিতে শিশু লালনের বৈশিষ্ট্যটা অধ্যয়ন করে ও নিজের লালন কর্মে সে কথা মনে রাখে। শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যটা সাধারণত মা-বাপেই ভালো জানে। তার ফলে সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি আবিষ্কারের সুযোগ থাকে তাদের, সে অভিজ্ঞতা তারা কিণ্ডারগার্টেনকে জানিয়ে দেয়। সোভিয়েত শিক্ষণবিদ্যায় মা-বাপের অবদান কম নয়, পরিবারের মধ্যে শিশু লালনের স্বকীয় অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁরা এ বিদ্যাকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিছু কিছু পিতা-মাতার অভিজ্ঞতা ছেপে বার হয়েছে ও সাধারণ অনুমোদন লাভ করেছে।

তাহলেও উল্টো ব্যাপারও ঘটে। শিশুর প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গি নেবে সেটা অনেক সময় মা-বাপে বুঝে পায় না, তার সঠিকভাবে মানুষ হয়ে ওঠার প্রয়োজনীয় সর্ত গড়ে দেয় না। এরূপ ক্ষেত্রে পরিবারকে সাহায্য করে কিণ্ডারগার্টেন।

পরিবারের সঙ্গে কিণ্ডারগার্টেন যে ভাবে কাজ করে তার পদ্ধতি ও রূপ নানাবিধ: সাধারণ জনকজননী সভা ডাকে তারা, এতে সমস্ত মা-বাপের পক্ষেই যা বাস্তব এমন সব প্রশ্ন আলোচিত হয়; নির্দিষ্ট এক একটা গ্রুপের মা-বাপের সভাও ডাকা হয়। তাতে সম্মিলিত কাজের ধারা স্থির করা সম্ভব হয়। মা-বাপের সাহায্যের জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়, তাতে দেখানো হয় পরিবারের মধ্যে শিশুর রুটিন হওয়া উচিত কী রকম, খেলাধূলা ও চর্চার কোণটি কেমন হবে, নির্দিষ্ট বয়সের শিশুর জন্যে কী কী বই ও খেলনা দরকার, শিশুর কী কী অভ্যাস দরকার ও কী ভাবে তা গড়ে তুলতে হবে, কী ধরনের পোষাক সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত ও সুন্দর ইত্যাদি।

কিণ্ডারগার্টেনে দেয়ালপত্র প্রকাশিত হয়, তাতে শিক্ষক ও মা-বাপেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা লিখে জানান। মা-বাপের জন্যে কিণ্ডারগার্টেন থেকে 'মুক্ত দ্বার' দিবসের ব্যবস্থা হয়, ব্যবহারিক ক্লাসও বসে, তাতে দেখানো হয় কী ভাবে শিশুর জন্যে উপযোগী ও সুন্দর পোষাক করা যায়, কী ভাবে গান

শেখানো উচিত শিশুদের ইত্যাদি। জনশিক্ষা দপ্তর থেকে মা-বাপেদের জেলা সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়, তাতে শিশু মানুষ করার প্রশ্নে রিপোর্ট পেশ ও পরিবারে শিশু লালনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতার বিনিময় হয়।

মা-বাপের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবেও কাজ চালায় কিণ্ডারগার্টেন। নিজের গ্রুপের শিশুদের মা-বাপের বাড়ি যান প্রতিটি শিক্ষক, এর ফলে বন্ধুর মতো অন্তরঙ্গ আলাপ মারফত মা-বাপে শিক্ষককে জানাতে পারেন কী তাদের মুশকিল, কী তাদের সাফল্য, পরামর্শ চাইতে পারেন ও সম্মিলিতভাবে লালনের কাজ ভবিষ্যতে কী ভাবে চলবে তা স্থির করতে পারেন। তাছাড়া, প্রতিটি মা-বাপেই নিজের উদ্যোগে কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষক বা ডাক্তারের কাছে পরামর্শের জন্য আসতে পারেন, প্রয়োজনীয় উপদেশ নিতে পারেন। কিণ্ডারগার্টেন ও মা-বাপেদের মধ্যে অন্তর্বর্তী সংযোগের কাজ করে জনকজননী সভায় নির্বাচিত জনকজননী কমিটি।

কাজাখস্তানের কুলুন্দা রাষ্ট্রীয় শস্য-খামারে
কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের শোবার ঘর

শিক্ষণবিদ্যার ক্ষেত্রে মা-বাপেদের জ্ঞান লাভ ও কিন্ডারগার্টেনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। পরিবারের সঙ্গে কিন্ডারগার্টেনের পারস্পরিক যোগাযোগ যত ঘনিষ্ঠ হবে, শিশু মানুষ করার কর্তব্য পালন ততই সহজ হবে মা-বাপের পক্ষে।

যে সব পরিবারে মা কাজ করেন না, ছেলে মানুষ করা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, তাঁরাও নিকটবর্তী কিন্ডারগার্টেনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেন। উদ্ভিদের বিজ্ঞান বিষয়ে কোনো জ্ঞান না থাকলে, এক একটা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য জানা না থাকলে টবের গাছও বাড়ে না। ঠিক মত মাটি বাছাই হল না, সার হয়ত জুটল না, নয়ত বড়ো বেশি সার দেওয়া হল, জল সেচ হল হয় কম নয় অত্যধিক, প্রয়োজনীয় রোদ আলোর ব্যবস্থা রইল না, গাছটাও শুকিয়ে উঠতে শুরু করে, বাড়ে অবসন্ন পঙ্গু হয়ে। আর শিশুর বিকাশের বৈশিষ্ট্য, তাকে মানুষ করে তোলার কর্তব্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন মা-বাপের পক্ষে তো আরোই বেশি দরকার।

শিশুর সঠিক ও সর্বাঙ্গীন লালনে পরিবারকে শুধু শিশু প্রতিষ্ঠানগুলিই সাহায্য করে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে জনকজননীর জন্য বিশেষ বিদ্যালয় আছে, পরিবারে শিশু মানুষ করার সমস্যা নিয়ে পাঠমালার ব্যবস্থা হয়, বিভিন্ন উদ্যোগ থেকে মা-বাপেদের জন্য বক্তৃতা চক্রেরও আয়োজন থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিবার ও শিশু প্রতিষ্ঠান — সুস্থ, আনন্দোজ্জ্বল মানুষ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় উভয়েই এক।

পরিশিষ্ট ১ নং

৪-৭ বছর বয়সের শিশুদের প্রভাতী ব্যায়াম
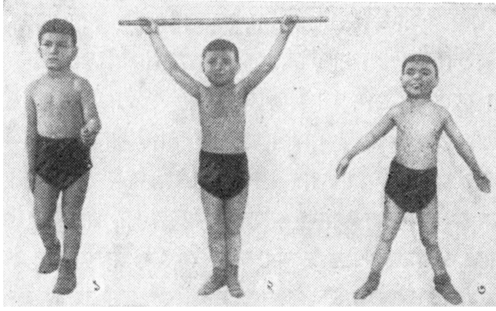
১। হাঁটা — ১৫-৩০ সেকেণ্ড শিশু ছোটো ছোটো পদক্ষেপে ঘরে পায়চারি করবে অথবা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পা ফেলবে।

২। লাঠি নিয়ে দেহ টান — হাত না বাঁকিয়ে লাঠি মাথার ওপর তোলা, পিঠ সোজা করা ও শরীর টান করা; ৩-৪ বার করণীয়।

৩। পিঠ বাঁকানো — দু হাত ছড়িয়ে পেছন দিকে নিয়ে যেতে হবে, বুক এগিয়ে পিঠে ভাঁজ পড়ে কাঁধের হাড় দুটো কাছাকাছি আসবে। ৪-৬ বার করণীয়।
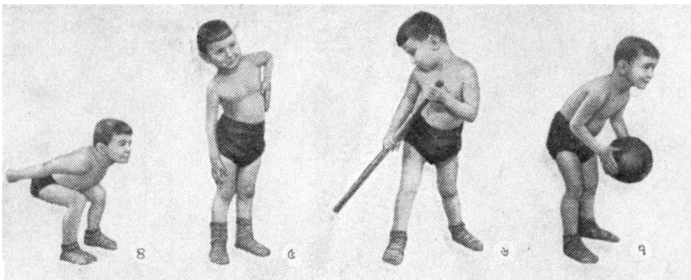
৪। ‘স্কি খেলোয়াড়’ — দ্ু পায়ে শক্ত হয়ে বসে হাত পেছনে চালিয়ে সামনে ঝোঁকা, স্টিক দিয়ে স্কি ঠেলবার সময় যে রকম ভঙ্গি হয়। ৩-৪ বার করণীয়।

৫। ‘পাম্প’ — ডাইনে বাঁয়ে ঝোঁকা, দেহ বরাবর হাতও সেই সঙ্গে উঠবে নামবে। প্রতি দিকে ৩-৪ বার করণীয়।

৬। ‘ঘাস কাটিয়ে’ — দ্ুই হাতে একটা লাঠি ধরে দেহকাণ্ডটাকে এপাশ ওপাশ ঘোরানো, এ দেশে যে ভাবে ঘাস কাটা হয়। প্রতি দিক ৩-৪ বার করণীয়।

৭। বল লোফা — রবারের বল দ্ুই হাতে ধরে ছোঁড়া ও লোফা। ৫-৬ বার করণীয়।

খাদ্য দ্রব্যে ভিটামিনের তালিকা

	খাদ্য	খাদ্যের প্রতি একশ গ্রামে কত মিলিগ্রাম ভিটামিন				
		এ	বি১	বি২	পিপি	সি
১	রাইয়ের রুটি	—	০·১৫	০·০৭	০·৯	—
২	গমের রুটি	—	০·০১	০·০৫	১·৮	—
৩	বাক হুইট	—	০·২০	—	৪·৪	—
৪	বার্লি	—	০·২০	০·১৫	২·৫	—
৫	ওট	—	০·৩০	০·০৬	১·০	—
৬	মটরগুটি	—	০·০৯	১·০০	২·৪	—
৭	কলাই	—	০·১৬	০·০৫	—	—
৮	গরুর মাংস	০·০৪	০·২০	০·১৭	৬·৪	২·০
৯	ভেড়ার মাংস	—	০·১৩	০·১২	—	—
১০	শুয়োরের মাংস	০·০৪	০·৪০	০·২০	৫·৬	১·৩
১১	মেটে	৩০·০	০·৪০	১·৬১	২২·০	৩১·৬
১২	মুরগী	—	০·১৬	০·১৬	৬·৯	—
১৩	পার্চ মাছ	০·০৬	—	০·০৩	—	০·৬
১৪	কার্প মাছ	০·২০	০·০১	০·০২	—	০·৫
১৫	কড মাছ	—	০·০৬	১·০৯	১·১	—
১৬	দুধ	০·১০	০·০৫	০·১৭	০·০৮	১·০
১৭	মাখন	১·২	—	—	—	—
১৮	পনীর	০·৯	০·০৩	০·৩৬	—	—
১৯	ডিম (১টি)	১·৩	০·০৭	০·১৬	০·১২	—
২০	আলু	০·০২	০·০৭	০·০৪	৫·৫	১০·০
২১	তাজা বাঁধাকপি	০·০২	০·১৪	০·০৭	৪·৫	৩০·০
২২	নুন জলে রাখা নোনা বাঁধাকপি	০·০২	০·০২	০·০৭	০·৩	২০·০
২৩	নুন জল ছাড়া নোনা বাঁধাকপি	০·০২	০·০২	০·০৭	০·৩	—
২৪	গাজর	৯·০০	০·১০	০·০৭	১৪·৪	৫·০
২৫	বীট	০·০১	০·১২	০·০৮	৪·৭	১০·০

	খাদ্য	খাদ্যের প্রতি একশ গ্রামে কত মিলিগ্রাম ভিটামিন				
		এ	বি ১	বি ২	পিপি	সি
২৬	শসা	০·০৬	০·০৬	০·০১	৮·০	৫·০
২৭	পেঁয়াজ	০·০২	০·০৭	০·০১	—	১০·০
২৮	লাল বিলাতী বেগুন	২·০০	০·০৭	০·০৪	১৬·৫	৪০·০
২৯	মুলা	—	০·০৬	০·০১	—	২০·০
৩০	লেটুস	০·০১	০·১৪	০·০৭	—	৩০·০
৩১	সরেল	৬·০	০·১০	০·১৮	৫·৮	৪৫·০
৩২	আপেল	০·০৯	০·০৪	০·০৪	৩·৫	৭·০
৩৩	অ্যাপ্রিকট	২·০০	—	০·০১	—	৭·০
৩৪	চেরি	০·৩০	—	—	—	১৫·০০
৩৫	আঙুর	০·০২	—	০·০১	—	৩·০
৩৬	ক্র্যানবেরি	—	—	—	—	১০·০
৩৭	গুজবেরি	১·১	—	—	—	৫০·০
৩৮	কালো কারেণ্ট	০·৭	০·০৬	—	—	৩০০·০
৩৯	লাল কারেণ্ট	—	০·০৭	—	—	৩০·০
৪০	র‍্যাসপবেরি	০·২৫	০·০৭	—	—	২৫·০
৪১	স্ট্র বেরি	০·০৫	—	—	—	৩০·০
৪২	কমলা	০·৩০	০·০৬	০·০৩	—	৪০·০
৪৩	ট্যাঙ্গারিন	০·৪৫	০·০৬	—	—	৩০·০
৪৪	লেবু	০·৪০	০·০৫	—	—	৪০·০

'রুচিকর পুষ্টিকর খাদ্য' পিশ্চেপ্রমিজদাৎ, মস্কো ১৯৫৪, পৃঃ ৩৮

রান্না করা খাবারে রক্ষিত ভিটামিন সি

	খাবার	সংরক্ষিত ভিটামিন সি (মূল ভিটামিনের অনুপাতে শতকরা কত অংশ)
১	তাজা অথবা নোনা বাঁধাকপির টাটকা সুপ . . .	৫০
২	৭০-৭৫° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে ৩ ঘণ্টা জ্বাল দেওয়া তাজা বাঁধাকপির সুপ	২০
৩	পট-হার্ব সুপ	৫০
৪	সেদ্ধ বাঁধাকপি	১৫
৫	খোসা শুদ্ধ সেদ্ধ গোটা আলু	৭৫
৬	খোসা ছাড়া গোটা সেদ্ধ আলু	৬০
৭	সেদ্ধ আলুর পিণ্ড	২০
৮	আলুর সুপ, টাটকা	৫০
৯	আলুর সুপ ৭০-৭৫° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে ৩ ঘণ্টা জ্বাল দেবার পর	৩০

পরিশিষ্ট ৩ নং

সোভিয়েত ইউনিয়নের কিণ্ডারগার্টেনে বরাদ্দ মাথা পিছু দিনে কত গ্রাম খাদ্য

সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা-বিজ্ঞান আকাদমির পুষ্টি ইনস্টিটিউটের সুপারিশ

খাদ্য	নগর		গ্রাম
	দিনে ৩ বার আহার	স্যানাটোরিয়ম ধরনের কিণ্ডারগার্টেন	
রাইয়ের রুটি	১০০	১৭৫	১০০
গমের রুটি	১০০	১২৫	১০০
সুজি	১০	২০	১০
আলুর সুজি	৮	৮	৮
শস্য দানা	১৫	২০	১৫

খাদ্য	নগর		গ্রাম
	দিনে ৩ বার আহার	স্যানাটোরিয়ম ধরনের কিন্ডারগার্টেন	
মাকারনি	১৫	২০	১৫
আলু	১৩০	২০০	১৩০
শব্জী	১৫০	১৭৫	১৫০
ক্র্যানবেরি	১৫	১৫	—
টাটকা ফল	১০০	২০০	—
চিনি	৪৫	৬০	৪৫
শুকনো ফল	১৫	১৫	—
টফি, লজেন্স, চকোলেট	৫	১০	৫
বিস্কুট	৫	৫	৫
কফি	৩	৩	৩
মাংস	৫০	৮০	৫০
মাছ	৫০	৫০	৫০
দুধ	৩০০	৫০০	৩০০
ছানা	৩০	৪০	৩০
টক ক্রীম	১০	১০	১০
মাখন	৩০	৫০	৩০
নুন	১৫	১৫	১৫
ডিম (কয়খানা)	০.৫	০·৭৫	০·৫

আপনার ছেলেমেয়েদের পড়ে শোনান

দাদুর দস্তানা

উক্রেনীয় উপকথা

বনের মধ্যে দিয়ে চলছিলেন দাদু আর তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়ছিল তাঁর কুকুর। চলতে চলতে চলতে তাঁর হাত থেকে একটা দস্তানা পড়ে গেল।

অমনি দৌড়ে এল এক নেংটে ইঁদুর, দস্তানার মধ্যে ঢুকে পড়ে বলল:

'এখানেই বাসা বাঁধব।'

এমন সময় থপাৎ থপাৎ করতে করতে এক ব্যাঙ এসে হাজির। শুধোল:

'ঘ্যাঙর ঘ্যাং, এই দস্তানায় বাস করে কে?'

'আমি কুটুর কুটুর নেংটে ইঁদুর। তুই কে?'

'আমি হলাম লম্ফ মহারাজ ব্যাঙ। আমাকে থাকতে দিবি?'

'আয় চলে।'

হল দুটি। এমন সময় দৌড়তে দৌড়তে দস্তানার কাছে হাজির এক খরগোশ। শুধোল:

'এই দস্তানায় বাস করে কে?'

'কুটুর কুটুর নেংটে ইঁদুর আর লম্ফ মহারাজ ব্যাঙ। তুই কে?'

'আমি হলাম দৌড়বাজ খরগোশ। আমায় থাকতে দিবি?'

'আয় চলে।'

হল তিনটি। দৌড়ে এল খেঁকশেয়াল।

'হুক্কা হুয়া, এই দস্তানায় বাস করে কে?'

'কুটুর কুটুর নেংটে ইঁদুর, লম্ফ মহারাজ ব্যাঙ আর দৌড়বাজ খরগোশ। তুই কে?'

'আমি হলাম শেয়াল পণ্ডিত। আমায় থাকতে দিবি?'

ব্যস্, চার জনে দস্তানার ভেতরে আস্তানা গাড়ল। একটু পরে গুটি গুটি এসে হাজির নেকড়ে বাঘ। দস্তানার কাছে এসে হাঁক পাড়ল:

'এই দস্তানায় থাকে কে রে?'

'কুটুর কুটুর নেংটে ইঁদুর, লম্ফ মহারাজ ব্যাঙ, দৌড়বাজ খরগোশ আর শেয়াল পণ্ডিত। তুই কে?'

'আমি হলাম চোখা-নাক নেকড়ে বাঘ। আমায় থাকতে দিবি?'

'কি আর করা, আয় চলে।'

ঢুকল নেকড়ে, হল পাঁচটি।

কোথা থেকে যেন হেলতে দুলতে এক বুনো শুয়োর এসে হাজির।

'ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ, এই দস্তানায় বাস করে কে, হ্যাঁ?'

'কুটুর কুটুর নেংটে ইঁদুর, লম্ফ মহারাজ ব্যাঙ, দৌড়বাজ খরগোশ, শেয়াল পণ্ডিত আর চোখা-নাক নেকড়ে বাঘ। তুই কে বটে?'

'আমি হলাম ঘোঁৎ-ঘোঁতানি শুয়োর। আমায় থাকতে দিবি?'

বোঝ ঠ্যালা, সকলেই দস্তানায় ঠাঁই চায়!

'কিন্তু তোর নধর শরীরটা যে আঁটবে না রে?'

'তা কোনো রকমে আঁটিয়ে নেব। দে থাকতে।'

'কি আর করা, আয় চলে।'

ঢুকল শুয়োর, হল ছ'টি। এত ঠাসাঠাসি যে পাশ ফেরা দায়। এমন সময় মড়মড় করে ডালপালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে দেখা দিল এক ভালুক। এও যে দস্তানার দিকে আসে! হেঁড়ে গলায় ভালুক হেঁকে উঠল:

'কে বাবা এই দস্তানায় বাস করে?'

'কুটুর কুটুর নেংটে ইঁদুর, লম্ফ মহারাজ ব্যাঙ, দৌড়বাজ খরগোশ, শেয়াল পণ্ডিত, চোখা-নাক নেকড়ে বাঘ আর ঘোঁৎ-ঘোঁতানি শুয়োর। তুই কে?'

'হুম্ হুম্ হুম্, আমি হলাম কম্পজ্বর ভালুক। তোদের এখানে তো বেশ ভিড় দেখছি। আমায় থাকতে দিবি?'

'তোকে ঢোকাই কি করে বল? এমনিতেই তো ঠাসাঠাসি।'

'ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়!'

'তা কি আর করা, আয় চলে। শুধু এক পাশে থাকিস বাপু।'

ঢুকল ভালুক, হল সাতটি। এত ঠাসাঠাসি যে দস্তানা ফাটোফাটো।

ইতিমধ্যে দাদুর টনক নড়ে — ঐ যাঃ, দস্তানা তো নেই। খোঁজ খোঁজ খোঁজ, দস্তানা খুঁজতে খুঁজতে দাদু ফিরে চললেন, আর কুকুরটা তাঁর সামনে

সামনে ছুটতে লাগল। দৌড়তে দৌড়তে দৌড়তে, কুকুরটা দেখে কিনা — দস্তানা পড়ে আছে আর নড়ছে। এই না দেখেই কুকুর ডাক ছাড়ল:

'ঘেউ ঘেউ ঘেউ!'

দস্তানার মধ্যে এরা তো ভয়ে কাঠ। লাফ দিয়ে বেরিয়ে, যে যে-দিকে পারল, বনের মধ্যে মারল ছুট। দাদু এগিয়ে এসে দস্তানা তুলে নিয়ে আবার চলতে শুরু করলেন। আমার কথাটিও ফুরোল।

লেভ তলস্তয়

তিনটি ভাল্লুক

একটি খুকুমণি বাড়ী থেকে বেড়াতে গেল বনে। বনের মধ্যে তার পথ হারিয়ে গেল, খুঁজতে লাগল ফেরার পথ কিন্তু পেল না, এসে পড়ল বনের মধ্যে একটা ছোট কুটিরে।

দরজা ছিল খোলা; সে ভিতরে উঁকি দিল, দেখল — কুটিরে কেউ নেই, ঢুকে পড়ল। এই কুটিরে বাস করত তিনটি ভাল্লুক। একটি বুড়ো ভাল্লুক, নাম তার মিহাইল ইভানোভিচ্। তার মস্ত চেহারা আর গায়ে ঘন লোম। আর একটি ছিল ভাল্লুকী। সে দেখতে মাঝারি, তার নাম নাসতাসিয়া পেত্রোভনা। তৃতীয়টি ছিল ছোট ভাল্লুক-বাচ্চা, আর তার নাম মিশুৎকা। ভাল্লুকেরা কেউ বাড়ী ছিল না, তারা বনে বেড়াতে বেরিয়েছিল।

কুটিরটায় ছিল দুটো কামরা: একটা খাবার ঘর, অন্যটা শোবার ঘর। খুকুমণি প্রথমে ঢুকল খাবার ঘরে, দেখল যে, টেবিলের ওপর আছে তিনটি বাটি, তাতে খিচুড়ি। প্রথম বাটিটা, বেশ বড়সড়, মিহাইল ইভানীচ'এর। দ্বিতীয় বাটিটা, যেটা মাঝারি, সেটা নাসতাসিয়া পেত্রোভনা'র; তৃতীয়টি, নীল রঙের ছোট বাটি, মিশুৎকা'র। প্রত্যেক বাটির পাশে একটা করে চামচ: বড়, মাঝারি ও ছোট।

খুকুমণি সবচেয়ে বড় চামচ নিয়ে সবচেয়ে বড় বাটিটা থেকে এক চুমুক খেয়ে দেখল; তারপর মাঝারি চামচ নিয়ে মাঝারি বাটিটা থেকে এক চুমুক খেয়ে দেখল; তারপর ছোট চামচটা নিয়ে নীল রঙের বাটিটা থেকে খেয়ে দেখল; মিশুৎকা'র বাটিটাই তার পছন্দ হল সবচেয়ে বেশী।

খুকুমণির ইচ্ছা হল বসে, দেখল টেবিলের ধারে তিনটি চেয়ার: একটি, বেশ বড়সড় — মিহাইল ইভানীচ'এর, দ্বিতীয়টা মাঝারি — নাসতাসিয়া পেত্রোভনা'র, আর তৃতীয়টি, নীল রঙের গদিমোড়া — মিশুৎকা'র। বড় চেয়ারটায় উঠতে গিয়ে সে গেল পড়ে; তারপর বসল মাঝারিটায়, তেমন আরাম পেল না; তারপর বসল ছোট চেয়ারটায় — হেসে উঠল, — এটা চমৎকার। নীল রঙের ছোট বাটিটা হাঁটুর ওপর রেখে সে খেতে সুরু করল। সবটা খিচুড়ি শেষ করে সে চেয়ারে বসে দুলতে লাগল।

ছোট চেয়ারটা গেল ভেঙে আর খুকুমণি গেল পড়ে মেঝের ওপর। সে উঠে দাঁড়াল, টেনে তুলল ছোট চেয়ারটাকে, ঢুকল গিয়ে অন্য কামরাটায়। সেথায় ছিল তিনটে বিছানা: একটি বড়সড় — মিহাইল ইভানীচ্'এর; দ্বিতীয়টি, মাঝারি — নাসতাসিয়া পেত্রোভনা'র; তৃতীয়টি, ছোট, মিশুৎকা'র। খুকুমণি বড়টায় শুল — বড্ড বড়; মাঝারিটায় শুল, বড্ড উঁচু; ছোটটায় শুল — বিছানাটা মনে হল ঠিক যেন তারই মাপের; সে তাতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভালুকেরা বাড়ী ফিরল খুব খিদে নিয়ে, তারা তখনই খেতে চায়। বুড়ো ভালুক তার বাটি নিলে, চেয়ে দেখেই গর্জন করে উঠল ভীষণ গলায়:

'কে চেখেছে আমার বাটি?'

নাসতাসিয়া পেত্রোভনা তার নিজের বাটি দেখে চেঁচিয়ে উঠল তত জোরে নয়:

'কে চেখেছে আমার বাটি?'

আর মিশুৎকা তার নিজের খালি বাটি দেখে কুঁকিয়ে উঠল তার মিহি গলায়:

'কে চেখেছে আমার বাটি, একেবারে শেষ করে?'

মিহাইল ইভানীচ তার চেয়ারের দিকে তাকিয়ে ভীষণ গলায় গর্জন করে উঠল:

'কে বসেছে আমার চেয়ারে, তাকে নড়িয়েছে জায়গা থেকে?'

নাস্‌তাসিয়া পেত্রোভ্‌না তার নিজের চেয়ারের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল তত জোরে নয়:

'কে বসেছে আমার চেয়ারে, তাকে নড়িয়েছে জায়গা থেকে?'

মিশুৎকা তার নিজের ভাঙা চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে, কুঁকিয়ে উঠল:

'কে বসেছে আমার চেয়ারে, ভেঙে রেখেছে তাকে?'

ভালুক তিনটি ঢুকল গিয়ে অন্য কামরায়।

'কে শুয়েছে আমার বিছানায়, তাকে এলোমেলো করেছে?' গর্জন করে উঠল মিহাইল ইভানীচ্ তার ভীষণ গলায়।

‘কে শুয়েছে আমার বিছানায়, তাকে এলোমেলো করেছে?’ চেঁচিয়ে উঠল নাসতাসিয়া পেত্রোভনা তত জোরে নয়।

আর মিশুৎকা ছোট টুল লাগিয়ে নিজের বিছানায় উঠে, কুঁকিয়ে উঠল তার মিহি গলায়:

‘কে শুয়েছে আমার বিছানায়?..’

হঠাৎ সে দেখতে পেল খুকুমণিকে, কুঁকিয়ে উঠল এমনভাবে যেন কেউ তাকে চিরে ফেলছে:

‘ঐ যে মেয়েটা! ধরো, ধরো! ঐ যে মেয়েটা, ঐ যে মেয়েটা! আই-ইয়া-ই! ধরো!’

ইচ্ছে ছিল মেয়েটাকে কামড়ে দেবে। খুকুমণি চোখ মেলেই দেখে ভালুক, ছুটল জানালার দিকে। জানালাটা খোলাই ছিল, সেও লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভালুকেরা আর তাকে ধরতে পারল না।

ভ্লাদিমির সুতেয়েভ

নেংটি ছানা আর পেনসিল

এক যে ছিল পেনসিল। ভোভার পেনসিল।

নানান ছবি আঁকত ভোভা, আর বাধ্যের মতো তার সব কথা শুনত পেনসিল। তাই পেনসিলটিকে ভারি ভালোবাসত সে।

একদিন ভোভা ঘুমুচ্ছে, এমন সময় টেবিলে উঠে এল এক নেংটি ছানা। দেখে কি, পেনসিল। দেখেই পেনসিলটিকে টেনে এনে হাজির একেবারে গর্তে।

পেনসিল বলে, 'দোহাই তোর, ছেড়ে দে। আমায় নিয়ে কী করবি। আমি যে কাঠ, খাবার তো নই।'

নেংটি বলে, 'না খাই, চিবুব। দাঁত শুড়শুড় করছে আমার, সারাক্ষণ কিছু একটা আমায় চিবুতেই হবে। এ্যাই!' বলেই সে কষে কামড় বসালে পেনসিলে।

'মাগো!' বললে পেনসিল, 'তবে অন্তত দে, শেষ বারের মতো কিছু একটা আঁকি। তারপর যা ইচ্ছে করিস।'

'বেশ,' রাজী হল নেংটি, 'আঁকতে চাস আঁক। তারপরে কিন্তু তোকে চিবিয়ে কুটি কুটি করব।'

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে পেনসিল আঁকলে একটা গোল রেখা।

'পনীর বুঝি?' জিজ্ঞেস করলে নেংটি।

'হতে পারে', এই বলে পেনসিল তার মধ্যে আঁকলে আরো ছোটো ছোটো তিনটে গোল।

'নিশ্চয় পনীর, এগুলো তার গায়ের ফুটো', ঠিক বুঝে নিলে নেংটি; 'ফুটোই বটে,' এই বলে পেনসিল আঁকলে আরো একটা মস্ত গোল।

'এটা নিশ্চয় আপেল।' চেঁচিয়ে উঠল নেংটি।

'আপেলই হয়ত,' এই বলে পেনসিল আঁকলে এক রকমের কয়েকটা লম্বাটে জিনিস।

'জানি, জানি। এতো সসেজ!' জিভ চেটে চ্যাঁচাল নেংটি, 'নে বাপু, শিগগির শেষ কর। ভারি শুড়শুড় করছে দাঁত।'

পেনসিল বললে, 'একটু দাঁড়া।' তারপর যেই না এই তেকোণগুলো এঁকেছে, অমনি চেঁচিয়ে উঠল নেংটি, 'এ যে দেখি অনেকটা সেই বে... থাম, থাম আর আঁকিস না!'

পেনসিল কিন্তু ততক্ষণে এঁকে শেষ করেছে লম্বা গোঁপ...

'সত্যিই একেবারে বেড়াল!' ভয় পেয়ে কিচ কিচ করে উঠল নেংটি। 'বাঁচাও। বাঁচাও!' বলে সেঁধল একেবারে গর্তের মধ্যে।

তারপর থেকে নেংটি ইঁদুরের নাকটিও আর দেখা যায়নি।

পেনসিল কিন্তু এখনো সেই রয়ে গেছে ভোভার কাছেই। কেবল একটু যেন ছোটো হয়ে এসেছে।

নিজের পেনসিলে তুমি একবার দেখো না চেষ্টা করে নেংটিকে ভয় দেখাবার মতো এমনি ধারা বেড়াল আঁকতে পারো কী না।

সের্গেই বারুজদিন

রবি ও শশী

দুই বাচ্চা — রবি আর শশী। সব বাচ্চার মতো এরাও নানা রকম মজা করে, মাঝে মাঝে কাঁদেও। ছোট ছোট শিশুরা যেমন করে খায় এরাও খায় তেমনি করে। দুধ চিনি দেওয়া পায়স পুরে দিতে হয় একেবারে মুখের ভিতরে। নইলে খেতে পারে না।

রুশ ভাষায় তাদের নাম বললে সেটা শোনাবে এই রকম: সন্‌ৎসে আর লুনা। রুশ ভাষা বুঝলে রবি শশীরও তা জানা থাকত।

কিন্তু রুশ ভাষায় ওদের কী বলে ডাকে এখনো ওরা তা জানে না।

'সন্‌ৎসে, সন্‌ৎসে!' ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে, রবি কিন্তু শুঁড়টা একটু দোলায় না পর্যন্ত।

'লুনা, লুনা!' বাচ্ছারা ডাকে শশীকে, কিন্তু তাদের দিকে ঘুরেও তাকায় না শশী।

'বোধ হয় ওদের নাম গুলিয়ে ফেলেছি আমরা', ছেলেমেয়েরা বলাবলি করে, 'দেখ না, ওরা কেমন এক রকম দেখতে।'

তা সত্যিই, রবি শশীর চেহারায় ভারি মিল। তাই বলে ভাই-বোন তারা নয়, এমন কি দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও নয়।

রবি আর শশী — এরা ভারতবর্ষের শিশু হাতী। খুব অল্পদিন আগে আমাদের দেশে এসেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু সোভিয়েত শিশুদের জন্যে উপহার পাঠিয়েছেন এদের।

শ্রীনেহেরু লিখেছেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিভ্রমণের সময় বহু ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল আর সর্বত্র তারা ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। এখন ভারতের শিশুদের তরফ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের শিশুদের জন্য দুটি যৎকিঞ্চিৎ বৃহদাকার উপহার পাঠান হল — দুটি শিশু হাতী। যদিও ইতিমধ্যেই বেশ বড়োসড়ো দেখতে, তবু বয়স তাদের সবে মাত্র এক বছর। সোভিয়েত ইউনিয়নের শিশুদের কাছে যাচ্ছে ভারতের শিশুদের দূত হয়ে, সঙ্গে নিয়েছে শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বের

বাণী... আশা করি, সোভিয়েত ইউনিয়নের ছেলেমেয়েরা ছোট্ট উপহার দুটির সঙ্গে মিতালি পাতাবে আর মনে রাখবে ভারতের ছেলেমেয়েদের, এই উপহার যাদের স্মরণিকা।'

দূর যাত্রার আগে

রবি আর শশী এসে পেঁছিল মস্ত সহর বোম্বাইতে। সমুদ্রের বন্দর পর্যন্ত নিয়ে আসা হল তাদের মালগাড়িটাকে, তারপর তাকে রাখা হল সাইডিং-এ। কিন্তু দেখা গেল যে যাত্রা তাদের তখনো শেষ হয়নি।

দূর যাত্রার জন্য তোড়জোড় শুরু হল।

বন্দরে করাত কুড়ুল চালানোর আওয়াজ শোনা গেল। জয়নার আর ছুতোর মিস্ত্রিরা রবি আর শশীর জন্য বানাতে লাগল বিশেষ খাঁচা। বাচ্চা হাতীদের জন্য এই খাঁচাগুলি হওয়া চাই বেশ আরামদায়ক, প্রশস্ত আর টেকসই। সেজন্য ওগুলো তৈরী করতে হবে সাধারণ তক্তা থেকে নয়, বানাতে হবে ভারতের সবচেয়ে কঠিন যে কাঠ সেই 'লোহা কাঠ' থেকে।

দর্জির দোকানে সেলাই-কল চলতে শুরু করল। দর্জিরা সেলাই করলে রবি আর শশীর জন্যে বিশেষ সাজ। হাতীদের সাজপোষাকগুলো হওয়া চাই সুন্দর, স্বাচ্ছন্দ্যকর আর অবশ্যই বেশ গরম। তাই সবচেয়ে গরম উলের কাপড় থেকে এগুলো সেলাই করল দর্জিরা।

লরির ভেঁপু শোনা গেল বন্দরে। ড্রাইভাররা জেটিতে নিয়ে এল চাল আর চিনি, আখ আর দুধ, আনারস আর পেস্তা বাদাম, কলাগাছ, সবুজ ঘাস আর শুকনো খড়। দূরের যাত্রায় রবি শশী যেন থাকে পরমানন্দে, স্বাস্থ্য রক্ষা করে, খেতে যেন পায় যত খুসী সবচেয়ে সুস্বাদু আর মুখরোচক খাবার।

তোড়জোড় যা কিছু সব শেষ হল। সেই সময় বোম্বাই বন্দরের জেটিতে এসে নোঙ্গর গাড়ল সোভিয়েত জাহাজ 'স্তাভরপল'।

'বোঝাই শুরু করা যাক,' বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন চেরনব্রোভকিন।

অবতরণের পালা

ষোল দিন ধরে জাহাজে চলেছে রবি শশী। তারপর 'স্তাভরপল' এসে পেঁছিল ওদেসায়। তীরে নামতে হবে এবার।

জাহাজের ডেক থেকে বাচ্চা হাতীশুদ্ধ খাঁচাগুলিকে তুলে নিয়ে এল ক্রেন।

সহরের রাস্তা দিয়ে রবি শশীকে নিয়ে যাওয়া হল দুটো লরিতে করে; চিড়িয়াখানার গেটের ভিতরে ঢুকে লরি গিয়ে দাঁড়াল হাতীশালের সামনে।

চিড়িয়াখানায় সাক্ষাৎ

আগে কখনো চিড়িয়াখানার প্রবেশপথে কিউ হত না, আজকাল হচ্ছে। তাতে আবার আজ রবিবার, লোকের ভিড় বিশেষ করে বেশি।

'আমাদের কিন্তু কিউ-এ দাঁড়াতে হবে। কী রকম মনে হচ্ছে?' ক্যাপ্টেন চেরনব্রোভকিন জিজ্ঞাসা করলেন ছেলেকে।

'তাই দাঁড়াব!'

ভভা চেরনব্রোভকিনের বয়স মাত্র পাঁচ বছর, কিন্তু সারাদিন ধরেই সে কিউ-তে দাঁড়িয়ে থাকতে রাজী; যাই হোক না কেন, যেমন করেই হোক দেখতেই হবে রবি আর শশীকে। বন্দরে যখন বাবার জাহাজ দেখতে গিয়েছিল ভভা তখন বড় হাতীদের দেখেছিল কিন্তু বাচ্চা হাতীদের ভালো করে দেখতে পায়নি — খাঁচার ভিতরে তাদের দেখা যাচ্ছিল না।

সারাদিন ধরে অবিশ্যি কিউ-এ দাঁড়াতে হল না। ক্যাপ্টেন চেরনব্রোভকিন ও তাঁর ছেলে কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেলেন রবি শশী খেলা করছে, টানাটানি করছে খড় নিয়ে।

প্রচুর লোকের ভিড় জমে গেল বেষ্টনীর চারদিকে। এই ভিড়ের মধ্যে সংখ্যায় কারা বেশি — বয়স্করা না শিশুরা তা কিন্তু বলা মুশকিল। যেমন ছোটোরা তেমনি বড়োরা সকলেই দেখতে চায় রবি শশীকে।

ভভা চেরনব্রোভকিন বাবার কাঁধে নেচে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'ওদের মধ্যে কোনটি কে?'

বাবা বুঝিয়ে দিলেন, 'ডান দিকের বাচ্চাটির নাম রবি আর বাঁ দিকেরটি শশী।'

ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়িয়েছিল তাঁর জাহাজের বন্ধুরা — ইলেকট্রিশিয়ান সকলোভ আর জাহাজী কলমিয়েৎস, সারেঙ্গ সাভর্সাকিন আর মেকানিক শ্লীকভ। রবি শশীকে দেখে 'স্তাভরপলের' জাহাজীরা ছাড়া কারা আর অতো খুসী হবে। আগে থেকে কোন ঠিক ছিল না, তবু ঠিক আজই তারা সব চিড়িয়াখানায় এসেছে তাদের পূর্বতন যাত্রীরা কেমন আছে তাই দেখতে।

'আর ওরা কেন তোমাদের দিকে তাকাচ্ছে না?' আগ্রহের সঙ্গে আবার জিজ্ঞাসা করল ভভা।

'বোধ হয় ভুলে গেছে', উত্তর দিলেন চেরনব্রোভকিন।

'ওরা এখনো বাচ্চা, আর লোকও এখানে মেলা। আমাদের খুঁজে পাচ্ছে না।' যোগ করল সকলোভ, যেন সে রবি শশীর হয়ে সাফাই দিতে চায়।

হঠাৎ এক অবাক কাণ্ড ঘটল।

রবি শশী বেড়ার দিকে ফিরে শুঁড় দোলাতে লাগল।

'দেখুন! দেখুন! চিনতে পেরেছে!' অবাক হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল সকলোভ।

জাহাজীদের খুসী আর ধরে না। চারপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারাও সবাই খুসী। আর ভারতীয় শিশু হাতী রবি আর শশী আনন্দে শুঁড় দোলাতে লাগল, অভিনন্দন জানাল তাদের নতুন পুরনো রুশী বন্ধুদের।

আলেক্সান্দ্র কোনোনভ

সোকোলনিকিতে নববর্ষ

মস্কোর শহরতলী সোকোলনিকি। একেবারে একটা বনের ধারে বলেই গাছটার জন্যে তাদের দূরে যেতে হয়নি। সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে সবুজ গাছটাকে বেছে নিয়ে তারা কেটে ফেলল আর সেটাকে নিয়ে এল অরণ্যের ইস্কুলে।

বাচ্চারা দেখল গাছটাকে শক্ত করে দাঁড় করাবার জন্যে সেটার তলায় কাঠের দুটো তক্তা ক্রুশ্-চিহ্নের আকারে আঁটা হয়েছে। তারপর বাচ্চারা নিজেরাই যে-সব সাজাবার জিনিস তৈরী করেছিল সেগুলোকে একটা বড় বাক্সে ভরে নিয়ে এল ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি ভোলোদিয়া। তার মধ্যে ছিল কাগজের ভালুক, খরগোস আর হাতি। কিন্তু সবচেয়ে যা ভালো সে ঐ লম্বা সাদা দাড়ি আর গোলাপী গালওলা বরফ-দাদু।

পরের দিন তারা সবাই সকাল-সকাল উঠে লেনিনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। বাইরে তখনো আলো রয়েছে, কিন্তু ছেলেরা ক্রমাগত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে প্রশ্ন করে চলেছে:

'লেনিন না এলে কী হবে?'

'আবার যদি তুষার-ঝড় হয় তাহলেও কি তিনি আসবেন?'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পেত্রোগ্রাদের একজন প্রবীণ শ্রমিক। লেনিনকে তিনি অনেক বছর ধরে জানেন। তাই তিনি কী বলেন বাচ্চার দল সে কথা জানতে চাইছিল।

তিনি জোর দিয়ে বললেন, 'তিনি আসবেন বলে থাকলে নিশ্চয়ই আসবেন।'

উৎসব আরম্ভ হবার সময় হয়ে গেছে, বাইরে তখন দারুণ এক তুষার-ঝড় চলেছে। পাইন গাছের ভেতর দিয়ে বাতাস শিস দিচ্ছে আর আকাশ থেকে দারুণ তুষার-পাত হচ্ছে।

দেরি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তখনো লেনিন পৌঁছননি।

তারপর বয়স্কদের মধ্যে একজনকে তারা ফিসফিস করতে শুনল:

'এ-রকম তুষার-ঝড়ের মধ্যে তিনি আসবেন বলে তো মনে হয় না।'

বাচ্চার দল আবার দৌড়ুল বুড়ো সুপারিণ্টেন্ডেণ্টের খোঁজে।

খুব দৃঢ় স্বরে তিনি বললেন:

'কিচ্ছু ভেবো না! মনে আছে তোমাদের কী বলেছিলাম: আসবেন বলে থাকলে নিশ্চয়-ই আসবেন তিনি।'

সবাই তারা অপেক্ষা করতে লাগল। জানালার শার্সিতে শুকনো তুষার ছুঁড়তে-ছুঁড়তে ঝড় গজরাচ্ছে। বাইরের অত হট্টোগোলের মধ্যে কেউ-ই শুনতে পেল না সামনের ফটকে একটা গাড়ী এসে থামল। গাড়ী থেকে লেনিন নামলেন।

তিনি ওপরতলায় গিয়ে টুপি আর কোট খুলে রুমাল দিয়ে মুখ থেকে ভিজে তুষার মুছলেন। তারপর সব বাচ্চারা যেখানে জমায়েত হয়েছে সোজা সেখানে হাজির হলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে চিনতে পারল সবাই, কারণ ইতিপূর্বে অসংখ্যবার তাঁর ছবি তারা দেখেছে! তাহলেও সবাই প্রথমে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল; লেনিনকে ঘিরে নির্বাক হয়ে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তারা দাঁড়িয়ে রইল।

লেনিনের কিন্তু খুব বেশী সময় লাগল না — কৌতুকভরা দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন:

'বেড়াল-ইঁদুর খেলা কে-কে তোমরা জানো?'

বাচ্চাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মেয়ে ভেরা প্রথমে উত্তর দিল:

'আমি জানি!'

লেওশা নামে ছোট্ট একটি ছেলে চিৎকার করে উঠল:

'আমিও জানি!'

লেনিন বললেন, 'বেশ, তাহলে তুমি বেড়াল হও।'

গাছটাকে ঘিরে ছেলেরা গোল হয়ে দাঁড়াল। বাচ্চা মেয়ে কাতিয়া ইঁদুর সাজল। লেওশা কাতিয়ার পেছনে দৌড়ুতে-দৌড়ুতে প্রায় যখন তাকে ধরে ফেলেছে তখন সে লেনিনকে আঁকড়ে ধরল আর তিনি তাকে হুস করে শূন্যে তুলে ফেললেন।

'বেড়ালটা এখন আর তোমাকে ধরতে পারবে না।'

তারপরে ইঁদুর হল সোনিয়া ছেলেটি। চট করে লেওশা তাকে ধরে ফেলল আর তখন তারা ভূমিকা বদল করল: সোনিয়া এখন বেড়াল, আর লেওশা ইঁদুর।

অনেকক্ষণ ধরে তারা খেলতে খেলতে ঘেমে উঠল।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল আর থপথপ করে একটা বিরাট ধূসর হাতি ঢুকল। ছেলেরা ভীত হয়ে আর্তনাদ করে উঠল। অনেকেই তারা ধূসর পিয়ানো ঢাকাটাকে চিনতে পেরেছিল — কিন্তু সেটার তলায় কারা রয়েছে? ঢাকাটা ধীরে-ধীরে দুলতে লাগল আর সামনে লম্বা একটা শুঁড় লাগল ওঠা-নাবা করতে। সেটার সামনের দুটো পা'য়ে ফেল্টের বুট জুতো আর পেছনের পা'য়ে সাধারণ জুতো। খুব খুঁটিয়ে না দেখলে সেটাকে সত্যিকারের একটা জ্যান্ত হাতি বলে মনে হতে পারে। জন্তুটা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে করতে গাছটার চারপাশে দাপাদাপি করল, তারপর শুঁড় দিয়ে সবাইকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে থপথপ করে দরজা দিয়ে গেল বেরিয়ে। খেলার ঘরের দরজাটা হাতিটার পেছনে বন্ধ হবার পর ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি আর পাহারাওলা সেই ধূসর ঢাকা ছেড়ে বেরিয়ে এল। সব সময় তারাই মজাদার খেলা আবিষ্কার করে থাকে। ঢাকাটাকে ভাঁজ করে রেখে তারা খেলার ঘরে এল। সেখানে তখন সব বাচ্চারাই হাসছে আর কে যে হাতি সেজেছে সেটা অনুমান করতে চেষ্টা করছে।

সেই সন্ধেটা তারা খুব ফুর্তিতে আর আনন্দে কাটাল। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল:

'এবার কানামাছি খেলা যাক!'

লেনিন তাতেই রাজি। তিনি যখন তাঁর চোখে রুমালটা বাঁধছিলেন, ভোলোদিয়া তখন গাছটাকে কোণের দিকে সরালো, যাতে বাচ্চার দল খেলবার বেশী জায়গা পায়।

লেনিন হাত বাড়িয়ে ডিঙি মেরে চারিধারে ঘুরতে লাগলেন। বাচ্চার দল ছড়িয়ে পড়ল। তারপর তারা পা টিপে-টিপে তাঁর দিকে এগিয়ে এসে চিৎকার করে উঠল:

'এই দেখ, এটা গরম!'

আর তিনি যখন খুব কাছে এসে পড়লেন তারা চেঁচিয়ে উঠল:

'তুমি পুড়ে যাবে!'

তাদের মধ্যে যাদের সাহস বেশী তারা গুড়ি মেরে তাঁর প্রসারিত হাতের ঠিক তলায় বসে রইল। তাদের না ছুঁয়েই তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সবাই তারা চেঁচিয়ে উঠল:

'কী ঠাণ্ডা! তুমি যে জমে যাবে!'

লেনিন দেখলেন বাচ্চার দল সবাই খুব চটপটে আর তৎপর, খেলাটাও জানে ভালো। চোখ বেঁধে তাদের ধরতে তাঁর অনেক সময় লাগবে। তাই তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন সোজা হেঁটে যাচ্ছেন। আসলে কিন্তু হঠাৎ তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর সবচেয়ে কাছে যে ছিল তাকে ধরে ফেললেন।

প্রত্যেকেই চেঁচিয়ে উঠল:

'এর নাম কী বলো তো! এর নাম কী বলো তো!'

যে বাচ্চা ছেলেটিকে তিনি ধরেছিলেন সে হাসতে আর ছটফট করতে লাগল। সে হচ্ছে সেনিয়া।

লেনিন ছেলেটির চুল স্পর্শ করলেন আর তারপর ছেলেটির কপালে আর গালে হাত বোলালেন।

'এতো সেনিয়া!'

ধরা পড়েছে বলে সেনিয়া দুঃখিত হল, কিন্তু লেনিন তাকে মনে রেখেছেন বলে খুসিও হল।

তারপর কাতিয়া একটি কবিতা আবৃত্তি করল, কিন্তু শেষটা ভুলে গিয়েছিল বলে সে কাঁদতে সুরু করল। লেনিন তাকে ভোলাতে চেষ্টা করলেন। কান্না থামিয়ে, চোখ মুছে, সে বলল:

'লেনিন, তুমি যেও না! আমাদের কাছে সব সময় থেকো।'

হেসে লেনিন বললেন:

'জানো তো, আমি কাছেই থাকি।'

ভোলোদিয়া গাছটাকে ঘরের মাঝখানটায় নিয়ে এল আর গানের মাষ্টার যখন পিয়ানো বাজাতে লাগলেন সবাই তারা সেটাকে ঘিরে নাচতে সুরু করল। বাচ্চা কাতিয়া লেনিনের উষ্ণ বড় হাতটা চেপে ধরে লাফিয়ে চলল।

ঠিক তখনি লেনিনের বোন আর স্ত্রী বড় একটা ঝুড়ি ভরে উপহারের জিনিসগুলো নিয়ে এলেন।

লেওশা পেল একটা বাঁশি, সেনিয়া একটা ড্রাম, ভেরা একটা বই আর কাতিয়া একটা পুতুল। প্রত্যেকের জন্যেই একটা করে উপহার।

বাচ্চার দল যখন বাঁশি আর ড্রাম বাজাচ্ছিল, চেঁচাচ্ছিল, আর তাদের নতুন খেলনা নিয়ে গাছটার চারিদিকে হুটোপুটি করছিল তখন লেনিন নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়ী চড়ে চলে গেলেন।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯১৯ সালের এক নতুন বছরের উৎসবে, মস্কোর কাছে সোকোলনিকিতে।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন

২১, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union